মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী, ২০২৪
মাঘ, ১৪৩০

সূচীপত্র

২১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

মাঘ ১৪৩০/ফেব্রুয়ারী ২০২৪

ব্রহ্মচেতন হোক জাগ্রত		৩
অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
অন্তরে শিব শক্তির জাগরণই ভগবান লাভ	তুলি চ্যাটার্জী	১৪
রাজা হতে চাই না	ভক্তিপ্রসাদ	১৭
বিশুদ্ধ মনে করি আবাহন ভগবানে	সায়ক ঘোষাল	১৮
সাধন বিস্তার ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ পথ	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৯
অমাবস্যার আলোয়	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	২১
জলে জল	মনোজ বাগ	২২
মন্ত্রের সাধক	স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২৫

সম্পাদক : রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রক : বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : ৫ টাকা

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মচেতন হোক জাগ্রত

সাধনার গভীর উপলব্ধির ক্ষণে সাধকের মধ্যে জেগে ওঠে ব্রহ্মতেজ। তার বাক-মন-প্রাণ—সবই যেন হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়। সাধক এমন ক্ষণে হয়ে ওঠেন প্রবল শক্তির অধিকারী। যে শক্তি একদিকে তার চিন্তা, কর্ম, উদ্যমকে দৃঢ় ও বলবতী করে। অহং এর আস্ফালন চলে যায়। সাধন মন তখন এক বিরাট মনের অধিকারী অথচ অত্যন্ত সংবেদনীল ও নমনীয় এক মনের পরিবেশ পান। জগতের বুকে এই মনই হয় বিজয়ী।

যঃ বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
সনঃ পুষাবিতা ভুবৎ। (ঋ. বে. ৩/৬২/৯)
(বিশ্বামিত্র ঋষিঃ বিশ্বদৃষ্টি)

বিরাট প্রভায় আলোকিত হয়ে এই মন কখনও বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আবার কখনও বুঝে ভগবানের এই অনন্ত প্রসারী ব্যাপ্তি থেকে নিজের স্বাতন্ত্রকে অনুধাবন করতে পারে একদিকে। আবার অন্যদিকে রয়েছে তার দৃষ্টির প্রসারণ। বিশ্ব ভাস্বর। কর্মপ্রেরণা এখন হয় স্বতঃই। জীবনের যা কিছু ছন্দ সবের মধ্যেই প্রবেশ করে এই স্বাচ্ছন্দের মনের প্রবাহ। যাকে এ পর্যন্ত কোনভাবে যায়নি দেখা, সেই হয় দৃষ্টি স্নাত এখন।

তত্র চক্ষুঃ গচ্ছতি ন বাকঃ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মঃ ন বিজানীম্ যথা এতৎ অনুশিষ্যাৎ।। (কেন. উ. ১/৩)

দৃষ্টি, শ্রুতি, বাক — এসবের সাধারণ সীমায় আবদ্ধ থাকার সময় এখন। দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতির যে সব প্রচলিত সীমা তার দ্বারা এখন ভগবৎ প্রকাশ প্রবাহকে ধরা যায় না। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনের প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত এক দৃষ্টি প্রদীপ। এই দৃষ্টিপ্রদীপ জীবনের চেতনাকে করে সমৃদ্ধ। বিশ্বদৃষ্টি দু'ভাবে হতে পারে — একটি জাগতিক দৃষ্টিতে বিশ্বদৃষ্টি — এর মধ্যে জগতের সবকিছুই হয় প্রতিভাত — আর্থ সামাজিক, প্রাকৃতিক থেকে শুরু করে সবকিছুই। আবার হতে পারে ভাগবতী দৃষ্টিস্নাত বিশ্বদৃষ্টি। তখন দেখা যায় সবই ভাগবতী প্রসাদে যুক্ত—ভাগবতী ভাবপ্রবাহস্নাত। যত্রজীব তত্র শিবই হয়েছেন অধিষ্ঠান।

আত্মাই জীবনের মাঝে শাশ্বত, ধ্রুব সত্য। অথচ এই জীবনের যা কিছু কর্মস্পন্দন, চিন্তার স্পন্দন, যা কিছু চেতন কণা সবই আত্মা থেকে জাত। আত্মা স্বাতন্ত্রে বিধৃত অথচ এই আত্মার সঙ্গে সেতুবন্ধন করবার কাজটি করতে পারে এই মানব মন। অথচ মনের সাধারণ অবস্থায় নয়, আত্মার কৃপাপরশের অদৃশ্য হাতই, আত্মার পরশে মনের পটভূমিকে করতে পারে সেতুবন্ধনের কার্যে সক্ষম্।

অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ বিধৃতিঃ।
এষাম্ লোকানাম্ অসংভেদায় ন এতং সেতুং।
অহোরাত্রে তরতঃ ন জরাঃ ন মৃতুঃ ন শোকা
ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্ সর্বে পাপ্মানঃ অতঃ নিবর্তন্তেহি
অপহত পাপ্মা হি এষঃ ব্রহ্মলোকঃ।। (ছা. উ. ৮/৪/১)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিলেন দিব্যদৃষ্টি। ঐ দিব্য দৃষ্টিই সম্বল করে অর্জুন এগিয়েছেন ভগবৎ দর্শনের অভিমুখে। অর্জুন কোনও বড় সাধক নন। তিনি দীর্ঘকাল সাধন ভজন করে ভগবানকে লাভ করেছেন, এমন নয়। অর্জুন কোনও নিবেদিত ভক্ত নন। তার কোনও ভক্তজীবন পর্ব নেই। অর্জুন সত্ত্বগুণের অধিকারী নয়। অর্জুন একজন যোদ্ধা। অর্জুন রজগুণের আশ্রয়ে লালিত। রাজবংশের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। তিনি বীর শ্রেষ্ঠ। তার যুদ্ধশক্তি সমগ্র প্রতিপক্ষের সবাইকে যোগ করলে যে শক্তি হয়, তারও চেয়ে বহু মাত্রায় বড়। অর্জুন শ্রেষ্ঠ বীর। অথচ সে ধীর, স্থির, চরিত্রবান, ধর্মপ্রাণ ধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী। অর্জুন অনায়াশেই ভগবানে নিবেদিত। তিনি ভগবানকে বরণ করেছেন বন্ধু, আপনতম করে।

অর্জুন তার নিবেদনের মধ্যে দিয়েই ভগবানকে আপনত্বে পেয়েছেন, বুঝেছেন ভাগবতী সাম্যাবস্থা। পরম সাম্যের বোধ সাধকের ধ্যানী দৃষ্টিতেই হবে মূর্ত। ভগবানকেই যিনি করেছেন আপন, আত্মার আত্মীয়, তারই হতে পারে চেতনার প্রকৃত জাগরণ। তিনি বুঝবেন অন্তর রাজ্যে রয়েছেন যিনি অতি সূক্ষ্মে, তিনি স্বতঃই জ্যোতির্ময়। আলোকময় হয়ে তিনি আলোক বিস্তার করবেন যে চাইবে তার কাছে। তিনিই আবার দ্রষ্টা হয়ে জীবনের সব চিন্তা, প্রেরণা, মনের বোধ, অন্তর প্রকৃতি সবই করে চলেছেন অবলোকন। ধ্যানী নিবেদিত প্রাণের মাঝে তিনি সহজেই ধরা দেন যদি থাকে নিবেদন। যিনি ঈশ্বরকে করেছেন বরণ, ঈশ্বর স্বতঃই তাকে করবেন বরণ। মনের মাঝে ফুটে ওঠে আলোক বলয়—ভগবানকে অর্পণ করে ঐ আলোক বলয় ফুটে উঠবে। জগতের সব প্রাণ মন হৃদয় হয়ে উঠবে ঐ আলোয় ভরপুর। সদাই দিব্য আলোকময় হয়েই বিরাজ করবে ব্রহ্মচেতন।

—ঃঃ—

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই পরিপূর্ণ বিজ্ঞান ঃ জড় বিজ্ঞানকে সাধারণ ভাষায় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। আর অধ্যাত্ম বিদ্যাকে নানা ভাবে বর্ণনা করে থাকলেও, বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করা হয় না। বিজ্ঞান বলতে যা কিছু বোঝানো হয় তার সবেরই মূলে রয়েছে একটা ধারণা যে এটি এমন কিছু যাকে প্রমাণ করা যায়। বিজ্ঞান হল সেটি— যার পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হতে পারে— এসবের বাইরে যদি কিছু থাকে তাকে আর যা কিছু বলে চিহ্নিত করা হোক না কেন, বিজ্ঞান বলা যাবে না। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির এক সাধারণ অবস্থা হল এর বিষয়গুলিকে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে বোঝা যাবে।

স্যার আইজ্যাক্ নিউটন তার অঙ্ক তত্ত্ব বা প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকায় মোটামুটিভাবে যেভাবে এবং যে সব উপাদানকে প্রাথমিক বলে নিয়েছেন সেগুলিই পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ভিত্তির আকার নিয়েছে। বিজ্ঞানকে বলা হয় যুক্তি নির্ভর। বিজ্ঞানের যুক্তি সব গড়ে ওঠে বস্তুর মধ্যেকার বস্তুগত চরিত্রকে বরণ করেই। বস্তুর এই বস্তুগত বা জড় চরিত্র হল যেভাবে বস্তুকে চেনা যায় সেটি। যেমন বস্তুকে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ বস্তু হল মেজারেবল বা এর ওজন ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনাযোগ্য বিষয়াদি রয়েছে। বস্তুকে সংখ্যায় নির্দিষ্ট করা যায়। অর্থাৎ এটিকে গুনে নেওয়া যায়। তখন কোয়ান্টিফায়েবল হয়ে বস্তুকে চেনা যায়। গুনতি করে বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায়। এছাড়া বস্তুর রয়েছে বিশেষ পরিচয়। এই বিশেষ পরিচয়ের মাধ্যমে বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায়। বস্তু তাই ইলেকটি ফায়েবল। অর্থাৎ বিশেষ পরিচয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বস্তুর নিজস্ব এক অবস্থা যে অবস্থাটি অন্যসব কিছু থেকে ঐ বস্তুকে আলাদা করে চেনা যায়, জানা যায়। অথচ এতসব পরিচয় পাওয়ার পরও ঐ বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এর কারণ বস্তুর আত্যন্তিক পরিচয় অন্তরে থাকে।

Even though psychology has informed business for decades there still sometimes seems to be an assumption that there is a cut off between mind and body, with little or no interaction between them. Since the advent of sophisticated scanning techniques, our increasing understanding that neuroscience is drifting below the neck and physiology is drifting above the neck is rowing through visibility of the exquisite interactions between nerves and hormones (neuroendocrine system) in the brain and body as a whole.

Testosterone is an anabolic steroid hormone like insulin and growth hormone. It is secreted from the testes in men and the ovaries in women. Catabolic steroid hormones include cortisol and adrenalin (mediators of short and long term stress). When the ratio of anabolic to; catabolic is high you have high performance. When the ratio is low you have stress and poor resilience.

(Tara Swart, Kitty Chisholm and Paul Brown, Neuro Science for Leadership, Palgrave-Macmillan, UK, 2015, p. 61)

বস্তুর ক্ষেত্রে যে সত্য বিচার ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সেটি প্রয়োগ করা যায়। বস্তুর বাহ্য পরিচয় আমরা পেতে পারি বিচারের পথ দিয়ে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ বাহ্য পরিচয়টি তেমন করে আত্যন্তিক পরিচয়ের বাহন হয়ে যায়। ব্যক্তির বাইরের পরিচয়টি তার অনেকটা ফুটিয়ে তোলে। বাহ্য পরিচয়কে অবলম্বন করেই ব্যক্তির বাহ্য স্বভাব ও তার পরিচয়ের মধ্যে সাযুজ্য বজায় রাখে। এরই মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এই যা কিছু জীবন পরিচয়ে। জৈব চেতনের যা কিছু জড় উপাদান রয়েছে সবেরই পরিচালক হল মন। মনের সংযোগ না হলে আর সব অঙ্গাদির কার্য ক্ষমতা হয়ে যায় স্তব্ধ। মনই সব অঙ্গাদির সংযোগকারী। মনের সঙ্গে সংযোগ হলেই সব অঙ্গের নিজ নিজ ক্ষমতার প্রকাশ হতে থাকে। মনই সবার মধ্যেকার সংযোগ করে থাকে আবার সেই সবারই মধ্যেকার যা কিছু শক্তি রয়েছে অবগুণ্ঠিত বা অপ্রকাশিত সে সবকেই কার্যকরী করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন মনের প্রত্যক্ষ সহযোগ ও সক্রিয় ভূমিকা। মনের প্রত্যক্ষ সহযোগ ও সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়েই প্রতিটি অঙ্গের কার্যক্ষমতার ব্যাপ্তি এ স্ফূর্তি ঘটবে। এরই পটভূমিতে ঋষিগণ প্রয়াস করেছেন মনের কার্যক্ষমতার বৃদ্ধির ও মনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য।

নিবিড় প্রশান্তির ক্ষণপ্রভায় ঃ

স্বস্তি ন পথ্যাসু ধনঃ বসু।
স্বস্তয়ে এষ বৃজনে খর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্র কৃথেষু যোনিষু।
স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১৫)

এই জীবন পথ হোক প্রশান্ত ভাবময় আলোকদীপ্ত।

হোক এই জীবনের নিত্য জাগরণের পথ উন্মুক্ত ভাবমার্গে।
যেমন করেই হয়েছে নিত্য বিকাশের পথ পর্যালোচন
জীবনের কর্ম চিন্তা স্বপ্নাদি হোক ব্যাপ্ত — বিকাশ ক্ষণে।
জগৎ মাঝে জীবন কর্মের হোক উন্মোচন ভাবপথে।
হয়েছে যা কিছু জীবনের জন্য অনন্ত ভাবধারায় যুক্ত
পরম্পরার এই সৃজন ধারায় হোক জীবনের নিত্য প্রকাশ।
ক্রম উন্মেষের এই পর্বে সত্য ঋতের আবাহনের হোক যোজনা।
নবীন জীবন প্রবাহে আসুক এ সত্যের প্রবাহে স্নাত নবীন প্রাণ।।

জগতের মাঝে ঐ আবর্তের আহ্বানে ঃ

স্বস্তিঃ রিদ্ধিঃ প্রপথে শ্রেষ্ঠাঃ।
রিকণ স্বস্তিভিঃ যাঃ বামম এতি।
সা নো৷ অমা সো অরণে নি পাতু।
স্বঃ অবেশা ভবতু দেবগোপাঃ। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১৬)

বিশ্বমাঝে আসুক এখন দেবধনের সত্যস্নাত প্রাণ
যা কিছু ভাগবতী প্রেরণার নিত্য প্রবাহে হয়েছে মূর্ত।
হয়েছে তারই বিষয় আবেশ হতে সত্য মার্গে উত্তরণ।
দেবতার এখন হয়েছে সময় সুরক্ষার কবচে করতে বৃত
যে চেয়েছে হতে দেবমার্গের পথিক পেয়েছে প্রেরণার দীপ্তি।
এখন তোমার ইচ্ছার বিকাশ হবে তোমারই অভীপ্সার পথে।
দেবতার সুরক্ষা এসেছে বর্তমানের জীবন পথের বিজয়-বরণে।
আনন্দের এই নিকেতনে এখনই রয়েছে দিব্য পথের প্রেরণা।।

জগজ্জননী উমা হৈমবতী ঃ

এবা প্লতেঃ প্রপথে শ্রেষ্ঠা।
রেকন সত্যভিঃ যা বামম এতিঃ।
বিশ্বঃ আদিত্যা অদিতে মনীষী ঈশান এসৌ নরঃ।
অমর্তেনা অস্তাবি জনৌ দিব্যো গয়েন।। (ঋ. বে. ১০/৬৩/১৭)

ভগবৎ ইচ্ছার প্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে।
হয়ে মূর্ত জগজ্জননী করেছেন দৈব্য প্রেরণা সঞ্চার।
উমা হৈমবতীর এই মূর্ত প্রকাশ মানবের উত্থানে
দিয়েছে প্রেরণার শক্তি জগতের উত্থানের এই পর্বে।
যে চিন্তার প্রবাহ দিয়েছ জীবন মাঝে এই প্রার্থনায়
করেছে উন্মোচন নিত্য পথের প্রাবল্যে তোমায় বরণে।
যেমন করে এসেছে জীবন মাঝে দেবচিন্তার ধারা
দিয়েছ তোমারই অমৃত সিঞ্চন তেমন করেই জীবন চেতনে।

দেবছন্দে তোমায় নিবেদনে ঃ

কথা দেবানাং। কতমস্য যামনি।
সুমন্তু নাম শৃণ্বতাম, মনামহে।
মো কৃতামি মৃলাতি কতমো।
নো ময়স্করত কতম উতঃ অভ্য ববর্ততি।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/১)

ঐ দেবতার পরশ এসেছে যদি হয়েছে মূর্ত আহ্বান।
যেমন করে দেবতার শ্রবণে এসেছে প্রার্থনার বার্তা,
হয়েছে যখনই নিবেদন দেবতার সমীপে হয়ে যে পরিচয়ে।
এসেছে ঐ নিবেদনের বার্তা পরমের প্রজ্ঞান স্বরূপে।

যে সধন পথের সঞ্চালন হয়েছে জীবনের নির্দিষ্ট পর্বে
হোক তারই নিত্য ভাব সঞ্চার সদা প্রকাশ প্রবাহে।
তোমার ঐ করুণার ধারায় হয়েছে স্নাত সাধন প্রাণ
যে প্রবাহ হয়েছে জীবনে প্রস্তুত কর অঙ্গীকার তার ছন্দ।

মনের গতি-প্রকৃতি ঃ মনের স্বাভাবিক প্রয়াস হল জাগতিক ছন্দের মধ্য দিয়ে এগিয়েও নানাভাবে স্বাতন্ত্রের দীপ্তিকে জাগিয়ে রাখা ও বিকশিত হতে সহযোগ দেওয়া। মনের অভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটাতে চাই চেতনার স্ফুরণ। চেতনার বিকাশ হলেই মনের এই বিকাশ ঘটতে পারে। চেতনার পরশেই মন হয় জাগ্রত। মনেরও রয়েছে জড় স্বভাব। জড়তার দ্বারা হয়ে আশ্রিত মন বিকশিত নয়। বিকাশ ঘটতে সূচনা হয় মনের উপর চেতনার প্রভাব যতই সঞ্চারিত হবে তত পরিমাণে। চেতনার পরশেই মনের বিকাশ সবচেয়ে ত্বরান্বিত হয়ে যেতে পারে। মনের অবস্থাগুলির প্রকৃত পরিচয় গড়ে ওঠে যখন মনের মাঝেই চেতনার প্রবেশ শুধু নয়, চেতনার আবর্তন ঘটতে থাকে।

চেতনার পরশে মন হয় যদি জাগ্রত তবে মনের বিকাশের ধারায় ঐ চেতনার স্বরূপেই ঘটে যায় পরিবর্তন। পাঁচটি স্তরে সাধারণভাবে মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষিপ্ত-মূঢ়-বিক্ষিপ্ত-একাগ্র-নিরুদ্ধ এই পাঁচটি অবস্থায় মন বিস্তৃত থাকে। মনের এই স্তর বিন্যাস তার একেকটি অবস্থায় একেক ধরনের প্রয়োজনের প্রতিটি অবস্থায় মনের প্রভাব জুড়ে যায় ঐ অবস্থায় শরীর ও মনের সংযোগের জন্য। অঙ্গাদির সঙ্গে যখন হয় মনের সংযোগ, মনেরও ঘটে যায় তৃপ্তীর আস্বাদন।

The neurochemistry of trust raises the possibility of moral markets and the nature of relationship and economic prosperity. But trust and risk taking are not just two sides of the same coin. In a recent thoughtful paper on the biology of human trust; it is recorded that while oxytocin increases trust in a risk-taking simulated game, testosterone has an antidote effect on oxytocin and decreases trust in the social situations but increases the appetite for financial risks. Maybe measuring testosterone on the way into the trading floor would predict the outcomes for the day and cortisol burls say who would be kept off the floor.

So the neurochemistry of risk taking is being actively explored, as is trust between people too. What is certain is that the continued exploration of risk taking is well on the agenda of experimental neuroscience.

The interplay of tertosterone and oxytocin – of risk and trust is explained in the Neural Tethering model that mobilises neurons.

(Tara Swart, kitty Chisholm, and Paul Brown, Neuroscience for Leadership, Palgrave, Macmillan, 2015, p. 68.)

ঋষিগণ যে সাধন ভজনের মধ্যে ছিলেন, যে পথ দিয়ে এগিয়ে ঋষিদের সত্যলাভ; সেগুলির সবই প্রাথমিকভাবে মনেরই পটভূমিতে ঘটে যায়। ঋষিগণের পদ্ধতি হল তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। এগুলি হল ঃ বিচার - বিবেচন - বিশ্বাস।

বিচার ঃ জগৎ ও জীবনের যা কিছু উপাদান ও প্রস্তাবনা ঋষিগণ সে সবের মধ্যে বিচার করে বুঝতে চেয়েছেন যে জীবনের উত্তরণ প্রয়োজন। উত্তরণের প্রসঙ্গটি হল— মনের সাধারণ আবিলতা কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া, মানবিক মনের সাধারণ অবস্থায় মনগুলি থাকে বাসনার গ্রাসে বন্দী। বাসনা হল আগ্রাসী। বাসনার আগ্রাসন প্রাণের প্রভায় জীবনের অঙ্গে অঙ্গে হয় সঞ্চারিত। সব অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হয় বাসনা। বাসনার দীপ্তি রয়েছে একেকটি অঙ্গের সঞ্চালনে। বাসনা দেহের অভ্যন্তরে ঘটে যায় নানা রঙে, নানা প্রকারে প্রকাশিত। যেমন বাসনার দ্বারা দীপ্ত হয়ে বিকশিত হয়ে যায় রসনায়। অন্নের নানা প্রকরণগুলি রসনার আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে। রসনার তৃপ্তির প্রয়াস ঘটে রসনার-বাসনা পূর্তিতে। রসনার-বাসনা পূরণ ঘটে ঐ রসনা সমূহের মধ্যেকার সব দীপ্তিকে অধিকার করে নিয়ে। রসনার তৃপ্তি ভোজনে-ভোগে। রসনার বাসনা যখন লালিত হয়, তখন রয়েছে মনের দৃপ্ত ভূমিকা। মন তার জড় পরিচয়ের মধ্যে যত সময় থাকবে আবদ্ধ ঐ রসনার বাসনাগুলি জড় মাত্রায় উদ্বুদ্ধ হবে। এমন ক্ষেত্রে মানবের বাসনার গতিবিধির সঙ্গে পাশবিক বাসনার গতিবিধির গড়ে ওঠে বিপুল পরিমাণ সাযুজ্য।

জীবন চেতনের সত্য-সুন্দরের প্রবাহ ঃ

ক্রতুয়ন্তি ক্রতবৌ। হৃত্মু ধীতয়ো।
বেনন্তি বেনাঃ। পতয়ন্তি আ।
দিশঃ ন মণ্ডিতঃ বিদ্যতে অন্য এভ্যঃ।
দেবেষু মে অধিকামা অয়ংসত।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/২)

যখনই হয়েছে সাধন পথ হৃদয়ের আবেশে পূর্ণ
এসেছে প্রেরণার ধারা নিত্য সঞ্চালনের আবর্তে।
ভাবপ্রদীপ হয়ে ভাস্বর দিয়েছে জীবনের মাঝে আহ্বান
সত্য সুন্দরের এই নিত্য প্রবাহ হয়ে ভাবময় হোক ভাস্বর।
এখন দেবতার ক্ষণ জীবন মাঝে প্রেরণা সঞ্চার তরে
হয়ে কৃপাপরশে জীবন মাঝে করতে জাগরণের আহ্বান।
যে শক্তির সংস্থানে হয়েছে জীবনের পথচলা এখন তার বিকাশ ক্ষণ।
দেবতার স্পর্শে হয়ে উন্মোচন জীবন চেতন হোক পূর্ণ জাগ্রত।

দেবতার কৃপার স্রোতে সাধন বিকাশ ঃ

নরাঃ বা শংসম পুষম এন গৃহ্যম্।
অগ্নিৎ দেবেৎ ইমভ্য অর্চসে গিরা।
সূর্যম্ এসঃ চন্দ্রম এসো যমং।
দিবি চিত্রং বাতম উষসম্ উক্তুম অশ্বিনা।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৩)

দেবতার তরে হয়েছে এখন অর্চন জীবনের নিয়োজনে
দিব্য অগ্নির যজ্ঞপথে এসেছে আহ্বান স্বতঃ প্রয়াসের মাঝে।
তোমায় দেখি তোমারই এই পথের মাঝে হয়েছে ব্যাপ্ত
যে ভাবপ্রকাশ দিয়েছ জীবনের গড়নে হয়েছে তারই উন্মেষ।
নানা রূপে এসেছো তুমি জীবনের জন্য হয়ে প্রকাশে মূর্ত।
যে ভাব প্রবাহে এসেছে তোমার নিত্য সংবেদ হোক সে দীপ্ত।
দেবতার উদার দানের এই ক্ষণে হয়েছে করুণা স্নাত চেতন
জীবনের নবীন পরিচয়ে এখন নবীন পথচলার দৃপ্ত উন্মোচন।।

ভগবৎ ভাব প্রবাহ ঃ

কথা কবিঃ তুবীরবান্ জয়াগিরাঃ।
বৃহস্পতিঃ বাবৃধতে সুবৃক্তিভিঃ।
অজ একপাত সূহঃ কেভিঃ ঋকম্ অভিঃ।
অহি শৃণোতু বৃধ্নো হবিমনি।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৪)

মনের বিশুদ্ধির প্রয়াস হয়েছে সূচনা এই সাধন মার্গে।
যেমনেই হয়েছে দেবতার স্পর্শ জীবন মাঝে প্রকাশে বা অপ্রকাশে
এসেছে সময় করতে বিনিয়োগ জীবন চেতনের পথ মাধুর্যে।
যে ভাব প্রদীপ হয়েছে জীবনে শিখাময় আলোকময় সময়ে
হোক তার স্ফূর্তি ভগবানে নিয়ত নিবেদনের এই পরম ক্ষণে।
দেবতার বার্তা এসেছে জীবন মাঝে এই উন্মোচন পর্বে।
দৈবী বাকে হয়ে ভাস্বর এসেছে জীবন মাঝে বিকাশ আহ্বান
যেমন করে নিত্য স্থিতির বিস্তৃত প্রসার হয়েছে জীবন মাঝে স্বতঃই।

দৈবী উন্মেষে দিব্য জ্যোতি ঃ

দক্ষস্য বাদিতে জন্মানি।
ব্রতে রাজানাং মিত্রঃ বরুণঃ বিবাসনি।
অতুর্ত পন্থাঃ পুরুরথৌ অর্যমা।
সপ্তহোতা বিপুরূপেষু জন্মষু।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৫)

বহু জীবনের পথ করে অতিক্রম জীবনের পথ ধরে এসেছি।
যে ভাব প্রভা হয়েছিল সঞ্চয় আদিতে এই চলার পর্বে পর্বে।
এসেছে সময় ঐ ভাবপ্রভার বিকাশ তরে নিত্য প্রবাহের পর্বে।
এখন জীবন মাঝে আসুক নিত্য পথের দৃপ্ত আকর্ষণ পর্বে।

ভগবানে করে অঙ্গীকার জীবনে দৃপ্ত উন্মেষের নিত্য প্রবাহে।
আলোর প্রভা এসেছে জীবনে দৃপ্ত উন্মেষের নিত্য প্রবাহে।
যে চেয়েছে সে এসেছে এই ভাবপথে বিশুদ্ধ মনের অঙ্গীকারে।
এখন সপ্ত ধাতুর সপ্ত গুণ নির্বাহ হবে জীবনের দৃপ্ত উন্মেষে।।

বাসনার বিষ ঃ রসনা যখন জেগে ওঠে, এর প্রভাব মনের উপর নানাভাবে পড়ে। রসনার একটা বাহ্য রূপ খাদ্য রসনা। খাদ্যের নানা উপাদানের প্রতি লোভ, আর আকর্ষণ মনকে ঐ দিকেই টানতে থাকে। রসনার আরও গূঢ় মাত্রা রয়েছে। যেমন রয়েছে জৈব রসনার দাপট। জৈব রসনার এই দাপট একবার শুরু হলে চলতেই থাকে। খাদ্য রসনার প্রভাব মনের উপর পড়ে কিছু মাত্রায় কিন্তু জৈব রসনার দাপট এমন যে এর প্রভাব মনের মাঝে প্রবল হয়ে উঠতে পারে। মনের মাঝে এর প্রভাব গভীর ও অনেকটাই স্থায়ী মাত্রার অথবা দীর্ঘতর হয়ে উঠতে পারে। জৈব রসনার প্রভাব ব্যক্তির জীবন দিক বদল ঘটিয়ে দিতে পারে। জৈব রসনার অধিকারে যখন মনটি চলে আসে তখন আর সব কিছুই হয়ে যায় ম্লান। জৈব আকাঙ্ক্ষার কোনও ক্ষান্তি হয় না। এটি মনের নিম্নগতির একটি প্রধান উপাদান হল জৈব তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা। জৈব তৃপ্তির বাসনার অগ্নি যেন বরাবরের শিখাময় হয়ে থাকে। জৈব তৃপ্তির দ্বারা আকর্ষণকে লালসা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। লালসাটি পাশবিক বৃত্তি। পশুর সমাজে লালসার দীপ্তিটি স্বাভাবিক এবং পাশবিক চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের ক্ষেত্রে এটি বিসদৃশ। মানুষের মধ্যে জৈব তৃপ্তির বাসনা যখন ক্রমাগত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায় তখনই মানুষ আর পশুর তফাৎগুলি যেন প্রায় ঘুচে যায়। জৈব তৃপ্তির লোভ ও লালসার এতটুকু যদি মনের উপর ক্রিয়া করে সে মনের পক্ষে ভগবান লাভ অসম্ভব।

Trust is a feeling, a mental action or state, involving relying on another to behave in a way consistent with the truster's assumptions and values, in a context where there is Tisk to the trustur. Trust is influenced by the hormone oxytocin, which also influences our affection and bonding with others. We trust those who are credible and reliable and are more likely to trust someone if we feel they are concerned about us, not just themselves. There is thus strong conclation between trustworthiness and self-control, perhaps because perceiving some one to be capable of managing themselves and their emotions imply that they are less likely to behave irrationally, erratically, impulsively and perhaps even dishonestly and selfishly.

(Tara Swart, Kitty Chishalm and Paul Brown, Neuroscience for Leadership, Palgrave-Macmillan, 2015, p. 57.)

জীবনের চলার পথে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার পর্বেই রয়েছে জীবনের সামঞ্জস্য বজায় রাখা। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সেই জীবনই হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে নিতান্ত কর্তব্য বোধের জৈব বৃত্তি। ঋষিগণের জীবন এমনই ছিল। ঋষিগণ ছিলেন বিবাহিত, সমাজের ও সংসারের পটভূমিতেই ঋষিদের ছিল জীবন সঞ্চার। সমাজ, সভ্যতা ও সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবাহিকতায় ন্যায়-সত্য ও ঋতের পরম্পরা গড়ে দিয়েছেন ঋষিগণ তাদের জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে। ঋষিগণ এ কারণেই পিতা বা মাতা হয়ে সমাজের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মের সত্য-ন্যায় ও ঋতের পরম্পরা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। এই পরম্পরাই বৈদিক সমাজ ও বৈদিক সভ্যতর প্রধান স্তম্ভ। ঋষিগণ বাসনা মুক্ত, কামনার প্রভাব বর্জিত সদাই। কর্তব্যের আহ্বানে তাদের এই পরম্পরা সৃষ্টি। পরম্পরার দুটি দিক রয়েছে একটি হল ঋষিগণের প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় পরম্পরা আর অন্যটি হল ঋষির আদর্শ, জীবনবোধ, জীবন দর্শন, এর ধারণের জন্য শিষ্য-পরম্পরা। ঋষিদের পুত্র-কন্যাদেরও হতে হত শিক্ষনবীশ। এর দ্বারা যে জ্ঞান ও সাধন প্রজ্ঞা ঋষিগণ করতেন জীবনে আহরণ অথবা উপলব্ধি তার সঞ্চালনে ছিল ঋষিদের তৃপ্তি। শিষ্যগণকে ঋষি সর্বদাই পুত্র-কন্যার সমান মূল্য অথবা বেশি মূল্য দিতেন। প্রয়োজন নয়, একজনের গুরুত্ব নির্ধারণ হত তার মধ্যেকার যে গুণগত মান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। গুণগত মান নির্ধারণে বড় ভূমিকা ছিল ঐ ব্যক্তির। আহৃত জ্ঞান, সাধন শৈলী, সত্য নিষ্ঠা, চেতনার দীপ্তি ও জ্ঞান-ভক্তি পথের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের মাত্রা। বিচারটি নির্ধারিত হত এদের মধ্যেকার সত্য-প্রীতি, সত্য পালন, নিষ্ঠা, জ্ঞান তৃষ্ণা, জ্ঞানভিত্তি, চরিত্রগুণ, কর্মপ্রীতি, ভক্তির দীপ্তি এবং জীবনে শ্রদ্ধার ভিত্তি।

জগৎ চেতনের পটভূমিতেই ব্রহ্ম চেতন ঃ

তে নো অবন্তো হবন অশ্রুতৌঃ।
হবং বিশ্বে শূন্বন্ত বাজিবঃ মিতদ্রবঃ।
সহস্রসা মেধসঃ অতাবিঃ আত্মনা।
মহো যে ধনং সমিথেযু জভ্রিরেঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৬)

অশ্বের গতিতে হয়েছে সাধন চেতনের প্রবাহ জীবনে।
যেমনে হয়েছে জীবনে সাধন প্রস্তুতি চলতে এগিয়ে দেবমার্গে।
হোক এখন ক্রমবিকাশের এই পর্বের হোক ব্যাপ্তি স্থিতি।
ভাব প্রকাশের এই নবীন ব্রতে এসেছে মন্ত্র প্রদীপ জাগ্রতে।
বিশুদ্ধ এই ভাবপ্রবাহ হয়েছে মনের উদার আহরণে।
বহু সহস্র ভাবকণা হয়েছে যুক্ত তোমারই ভাববিকাশের সূত্রে।
ভাবনার দীপ্তি হোক প্রবল মহা আনন্দের ভাব প্রবাহের ক্ষণে
দেবভাবের স্পন্দন সব হোক প্রবল প্রবাহের এই আনন্দ ক্ষণে।।

সাধন অন্তরের উন্মোচনে ঃ

প্র বো বায়ু রথযুজং পুরংধি।
স্তোমৌ কৃণুধ্বং সখ্যায় পুষনম্।
হি দেবস্য সবিতুঃ সর্বহমনি ক্রতুং
সচন্তে সচিতঃ সচেতসঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৭

যেমনে হয়েছে ভাববিকশ প্রেরণার প্রসারের এই ক্ষণে।
তোমায় করে আহ্বান দৃপ্ত চেতনে নিত্য ভাবপথে
ঐ অনন্তের এখন হয়েছে ভাবপথের আবরণ উন্মোচন।
দেবতার পথে হয়ে ভাস্বর দেব প্রাচুর্যের ক্ষণমাধুর্যের বরণে।
জীবনের কর্মপথের আনন্দ মুখর এক অনবদ্য প্রেরণায়।
স্বতঃ বিকাশ যবে হয়েছে করতে বরণ দেবতার নিজ উন্মোচনে।
এখন বিশ্বমাঝে হয়েছে তোমার ব্যাপ্তি, অপরূপ একাত্মতায়।
সবিতার প্রকাশে আলোকময় সাধন উন্মোচনে।

দেব উপলব্ধির প্রবাহে ঃ

ত্রিঃ সপ্ত সহস্রা নম্যৌঃ মহীঃ অপিঃ
বনষ্পতীন্ পর্বতম্ অশ্বিম্ উতয়ে।
কৃষাণু অস্ত্রেন নিষ্যং সর্বস্থঃ।
আ রুদ্রং রুদ্রেষু রুদ্রিয়ঃ হবামহে।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৮

দেবতার এই অগ্নিরূপের সাধন হয়েছে ব্যাপ্ত জগতে।
এখনই এসেছে আহ্বান জীবন ময় এই জাগরণ ক্ষণে
যে প্রেরণার শক্তি হয়েছে মূর্ত দেবতার দানে জীবন মাঝে
হোক ঐ প্রেরণার কর্মস্রোত জীবনের গভীরে নিত্যভাবে।
এখন আসুক এই দিব্য ভাবের মূর্ত প্রকাশ জীবনে
ঐ অনন্তের পথ মাঝে দিব্য ভাবের প্রশান্ত প্রবাহে।
সহস্র নদীর ধারার পরিণতি যেমনে অনন্ত সমুদ্র মাঝে
দেব রূপের বিভিন্নতায় হয়ে মগ্ন নবীন ভাবপথের সাধনে।

দেবচেতনের মূর্ত স্রোতপথে ঃ

সরস্বতী সরযু সিন্ধু উমিভিঃ।
মহী মহীরবসা যন্তু বক্ষণী।
দেবীং অপো মাতর। সদয়িতৌ।
ঘৃতবৎ পয়ৌ মধুমৎ নো অর্চতঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/৯)

দৈবী মাতার স্রোতরূপের কৃপার প্রবাহ এসেছে জীবনে
বিশাল নদী প্রবাহে সরস্বতী সরযু সিন্ধুর ভাবপথে
নিত্য আগমনের এই ভাবধারায় হয়েছে মূর্ত যে প্রকাশ
এখন হবে তারই জগৎ আবেশ অনুভবের পথ মাঝে।

যে পথ প্রবাহ রয়েছে উন্মুক্ত করতে সিঞ্চন জীবন বারি
জগতের এই ক্ষণপ্রবাহে হোক সে ভাব সংবেদ উন্মোচন স্বতঃই।
এখন আসুক জীবন পথের নিত্য উন্মোচনের ক্ষণপ্রভা স্বতঃই
হোক ব্যাপ্ত এই দৃপ্ত প্রবাহ জীবন মাঝে দেবচেতনের মূর্ত স্রোতে।।

মুক্ত মনে সাধন ঃ বাসনার জালে আবদ্ধ মন সদাই এক ক্ষুদ্রত্বের সীমায় থাকে আবদ্ধ হয়ে। বাসনার আক্রমণ জীবনের পটভূমিতে একবার হলেই তার রেশ চলতেই থাকে। মন যদি একবার বাসনার রসের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যায় তবে মনের সত্যি করে নিষ্কৃতি হয় না। বাসনায় বন্দী মন ক্রমে হয়ে ওঠে লোভাতুর। লোভ এমন মাত্রা পেয়ে যায় যে-লোভ চরিতার্থ করতে ব্যক্তি সাধারণ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। এরকম ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজ ভাবধারা, নিজস্ব চিন্তা, প্রতিভার দীপ্তি হয়ে যায় গৌণ। ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়ে ওঠে এই আহ্বানের ভাব দীপ্তি। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে তাঁর জগৎ ব্যক্তির মন প্রাণের পরও আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার সমর্পণে দৃঢ় হয়ে যায়। তখন ই ব্যক্তির অন্তর-বাহির অন্য প্রভায় প্রভাবিত ও বদ্ধ হয়ে যায়। এই মনের জড় অবস্থাটি বাইরের প্রচার শুরু করতে হয়। এমন ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে।

বাসনা-কামনার কোনও একটি উপাদান থাকলেই তার প্রভাব মন-প্রাণ-হৃদয়ের সব সৎ উপাদান ও সৎ উদ্যোগকে নষ্ট করতে হয় তৎপর। বাসনার বীজ ক্রমে প্রসারিত হয় এর লালনে। অর্থাৎ বাসনার স্ফূর্তি যদি হয় একবার তবে আবার নতুন বাসনার বীজ ঐ সাথেই এসে যায়। বাসনার পূরণ দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্বাপণ হয় না। বরং একটি বাসনার পূর্তি অন্যের উদ্গাতা।

Gut instinct is about intuition, judgement and decisiveness. Look out for signs or stories in life that guide the sixth sense. And also look inwards for that 'gut wrenching' doubt and indecision versus the 'I just know it is may gut' kind of confidence. These can often manifest as actual visceral feelings as the viscera or internal organs are actually supplied by nerves communicating with the brain. One can only guess that is where the metaphor comes from. This is really something that develops with wisdom, and there are no short cuts to gaining that apart from fully embracing lie and all it throws, at you, to sculpt. your brain as much by your response as by the event itself. Only meditation can accelerate this as far as we know currently.

(Tara Swart, Kitty Chisholm and Paul Brown, Neuroscience for Leadership, Palgrave Macmillan, 215, p. 142)

সাধন প্রস্তুতির প্রধান প্রয়োজন বাসনার প্রভাব থেকে মুক্তি। বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত মন এক দিব্য চেতনের পর্বে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হয়ে যায় প্রস্তুত। যে ভাব বিকাশ জীবের অন্তর মাঝে ভাগবতী আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করতে পারে তারই বিশেষ প্রকাশ যখন বাসনার বীজ আর তারই জন্য বাসনার বিভিন্নতায় ব্যাপ্ত হয়ে যায় অন্তর জগৎ। জীবের সাধন পর্বে এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হয় বাসনা বিহীন মন।

বাসনা বিহীন মন তার আবিলতা মুক্ত হয়ে যখন ভগবানকে চাইতে শেখে তার সাধন পর্বের সূচনা হয়। সাধন পর্বেরই মাঝে ক্রমে সত্য লাভ হতে থাকে। বাসনার আকর্ষণ যখন ঝরে যায় ঐ মনের মাঝে যে চেতন প্রদীপ ফুটে ওঠে ঐ চেতনটি সাধারণ ও স্বাভাবিক মানবিক চেতন থেকে হয়ে যায় স্বতন্ত্র। এর ফলে যে নবীন চেতন পটভূমি প্রস্তুত হয়, ঐ নবীন পটভূমি হল সত্যলাভের জন্য উপযুক্ত। এই পটভূমিতেই ঋষির প্রজ্ঞা প্রভা হয়ে ওঠে বিকশিত। বাসনা বিহীন মন হল বিশুদ্ধ মনের প্রকাশ সূচক। বাসনার বিষ ঝরে গেলে জীব ক্রমে হতে পারে অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব মুক্ত। যেমন রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, আবিলতা, অহং প্রভৃতির প্রভাব থেকে ক্রম মুক্তির ফলে জীবের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় নবীন যাত্রার সূচনা হয়। এই নবীন যাত্রা জীবের জীবন পটভূমিতে, জীবনের সত্যের মাঝে ব্রহ্ম সত্যকে আলিঙ্গন করে নিয়ে আসা। ভগবান এখন সাধকের জীবন পটভূমিতেই জাগতিক সত্যের মধ্যেই ধরা দেবেন। সাধকের জীবন পটভূমিতেই ভগবান নিজেই ফুটিয়ে তোলেন। প্রতিটি পর্বেই ভগবত্তার প্রভা সঞ্চারিত হয়ে থাকতে পারে। এরই মধ্যে জীবনের সত্য ও ভাগবতী সত্য বিষয়ে এখন রপ্ত হয়ে গিয়ে স্বতঃই হয়ে পড়ে ভাগবতী সত্যের দিকে আকৃষ্ট। ভাগবতী সত্যকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে যখন হয়ে ওঠে ঐ সত্যের সঙ্গে নিজ নিজ পরিচয়, ক্রমাগতভাবে আরও গভীরে নিয়ে যায় ঐ সাধন প্রাণকে। সত্যের বোধ শুরু হলেই তার আনন্দময় আকর্ষণ আরো একাগ্রতায় ভরপুর হয়।

রুদ্র মাতার করুণাধারা ঃ উত মাতা বৃহৎ এবা শৃনোতুঃ নঃ।
ত্বষ্টাঃ দেবেভিঃ জনিভিঃ পিতা বচঃ।
ঋভুক্ষাঃ বাজৌ রথস্পতি ভর্গোঃ
রন্বঃ শং সঃ শসমানস্য পাতুনঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/১০)

ঐ দেবমার্গের সব মূর্ত প্রবাহে হোক সংযোগ ভাব স্পন্দন
যে জীবন পথ হয়েছে উন্মোচন এই নিত্য বিকাশের মূর্ত প্রভায়
হোক তোমারই স্পর্শের দীপ্তি সঞ্চার এই দেবপথ প্রবাহ তরে।
দেব মাতার এই নিত্য প্রকাশ প্রবাহে হয়েছে সত্যময় ছন্দ।
যে ভাবমার্গ হয়েছে ব্যাপৃত জীবনের এই দৈবী উন্মেষের ক্ষণপ্রভায়।
হোক তারই ব্যাপ্ত বিকাশ এই জীবনের পরম্পরায় মাধুর্য মাঝে।
সত্য-জ্ঞানের যে এসেছে দেবরূপের বিভিন্নতায় সাধনে
এখন হোক নিত্য নিরঞ্জনের দৃপ্ত পরশ জীবন ভূমি মুক্ত উন্মেষে।

দিব্য আনন্দের চেতন প্রবাহে ঃ

রন্বঃ সংদৃষ্টৌ পিতুমাস ইব ক্ষয়ঃ।
ভদ্রা রুদ্রানাং মরুতাম উপস্থিতিঃ।
গোভিঃ ষ্যাম যশসৌ জনেষুঃ
আ সদা দেব্যেস ইলয়া সচেম এহি।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/১১)

মন্ত্রের পথ প্রবাহ ধরে করি আবাহন তোমায় অনন্তে
যে ভাব দীপ্তি এসেছে এখন সদা প্রকাশ পথ মাধুর্যে
যে কর্ম পথে চলেছে জীবন যান তোমায় করতে আহ্বান জগতে
অনন্তের এই সীমিত ক্ষণের প্রকাশ পর্বে হয়েছে জীবনের গতি।
এই পথ মাঝে আসুক দেবমাতার দিব্য জ্যোতিঃ প্রবাহ স্বতঃই
জাগরণের এই ক্ষণ মাধুর্যে তোমায় একান্ত নিবেদনে।
ভক্তির জীবন ভূমি এখন জগৎ পথের একান্ত আকর্ষণে
দিব্য আনন্দের চেতন পরশ কর উন্মোচন জীবনের জাগরণ তরে।।

দেবতার আহ্বানে দেবতার দানে ঃ

যাং মে ধিয়ং। মরুৎ ইন্দ্র।
দেবা অদদান। বরুণঃ মিত্রঃ যুয়ম্।
তাং পীপয়ৎ পয়াসেব ধেনুং।
কুবিৎ গিরো অধি রথে বহায়ঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/১২)

দেবতার দানের এই প্রাণশক্তির পরশে হয়েছে সম্ভার
এখনও রয়েছে নিত্য দিনের দৃপ্ত প্রবাহের অবাধ আমন্ত্রণে।
যে চিন্তার বীজ দিয়েছ জীবন মাঝে করতে স্থিত সাধন
এখন দাও প্রেরণার দীপ্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মপ্রবাহে
তোমারই সাধন ব্রতে এসেছে আহ্বান তোমা হতেই জীবনে।
এখন এই প্রসাধন লেপন ব্রতে হয়ে নিমগ্ন পেয়েছি তোমায়।
জীবন মাঝে এসেছে যে ব্যাপ্তি ঐ মুক্ত বিহঙ্গের প্রতি সদাই
দেবযান হয়েছে প্রস্তুত জীবনে করতে একান্ত উন্মুখ সময়ে।

বহুর প্রকাশে একের জাগরণ ঃ

কুবিৎ অঙ্গ রথিত যশা যথা চিদস্য অন্ব স্রোতে।
নঃ সজাতস্য মরুতৌ বুবোধাথঃ।
নাভা যত্রঃ প্রথমং সং ন সামহে।
তত্র জামিত্বম্ অদিতিঃ দধাতু নঃ।। (ঋ. বে. ১/৬৪/১৩)

মহাসৃষ্টির মহাব্যাপ্তি করেছে বিস্তৃত প্রকাশ।
বহুর নানা অজ্ঞানতার বাধা পেরিয়ে এসেছে জাগরণ ক্ষণ।
যে বার্তা ছিল সভ্যতার এক বিশেষ প্রকাশ পরম্পরায়।
তোমায় জেনেছি পেয়েছি, বার্তা সময়ের পর্বে পর্বে।
বিশ্বমাঝে হয়েছে মূর্ত চেতনের জগৎ প্রকাশ পর্ব।
বিশ্বমাতার মহা করুণার ধারা করেছে ব্যাপৃত জীবনে।

দাও তোমার নিত্য দিনের দিব্য পরশ জীবনচেতন মাঝে।
যে ভাব ঐ দিব্য প্রকাশ মাধুর্যের বহুরই মহান এক প্রকাশ।।

দৈবী গুণ ঃ বিশুদ্ধ মনের পটভূমি ঈশ্বর সাধনের জন্য উপযুক্ত। বিশুদ্ধ মন স্বতঃই সত্য অভিলাষী। বিশুদ্ধ মন প্রস্তুত হয়ে যায় বিশুদ্ধ ভাবনার জন্য। বিশুদ্ধ ভাবনার দীপ্তি যদি এসে যায় জীবনে তবে সে জীবনের স্বাভাবিক অভীপ্সা হয়ে ওঠে সত্ত্বগুণের জন্য আকর্ষণী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার পরম্পরার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে জীবন পথ। অবশ্য সংখ্যার বিচারে এই পর্যায়ের চরিত্রগুলি খুবই কম, বলা যেতে পারে, বহু বহুর মধ্যে এক-দু'জন প্রকৃতির অমোঘ বিধানে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে একটা মিশ্রণের অবস্থা। ভাল-মন্দের মিশ্রণ থেকে যায় চরিত্রে. ভাল অংশটি বিবেককে জাগ্রত রাখতে হয় সচেষ্ট। মন্দের ভারে ভাল আর ঐ বিশেষ জাগরণে সক্ষম হয় না, সামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া।

দেবাসুর সম্পর্কে দেবতাগণ নির্বিকার এবং অবৈরী মনোভাবের হয়েই পর্যায়ক্রমে অসুর শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। অসুর শক্তি তার লোভ আর লালসার উপকরণ ও নানা ধরনের বাসনা-কামনার দিকগুলিকে পরিপূর্ণ করবার জন্য জড় শক্তির আশ্রয় নেয়। জড় শক্তি চৈতন্য নিরপেক্ষ অথবা চৈতন্য বিরোধী। জড় শক্তির সাধারণ অভিমুখ হল যে কোনও উপায়ে বিজয় লাভ। বিজয়ের ভাবনায় জড় শক্তির প্রাথমিক উদ্যোগ নিজ স্বার্থ-রুচির পটভূমিতে সব লোভনীয় ভোগ্য বিষয় ও বস্তুর অধিকার অর্জন করা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবৎ গীতা কথনে অর্জুনকে বলেছেন দৈবী সম্পদ আর আসুরিক সম্পদ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দৈবী সম্পদ বর্ণনা করে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ ঃ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমঃ চ যজ্ঞ চ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ আর্জবম্।। (গী. ১৬/১)

অর্থাৎ, দৈবীগুণের আকর হল ভীরুতা থেকে মুক্ত থাকা — সর্বদাই অথবা বহু ক্ষেত্রে ভয়ের আবর্তে জড়িয়ে গিয়ে জীবনের মৌল ভাগবতী কর্মের পথে এগিয়ে যেতে অনীহা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ক্রমাগত হারাবার ভয়; মৃত্যুভয়, না পাওয়ার আবর্তে মনের খেদ এসবই পরিত্যাগ করা আবশ্যিক ভগবৎ পথের জন্য।

সত্ত্ব সংশুদ্ধি অত্যন্ত আবশ্যক। এর ফলে অন্তর-বাইরে বিশুদ্ধতার পথ ক্রমাগত উন্মুক্ত হয়ে যায়। বিশুদ্ধতার প্রধান ক্ষেত্র—মন। মনের মাঝে সর্বদাই উদার সর্বজনীন ভাব আর ভগবৎ চিন্তার মধ্যেই মনকে ধরে রাখতে পারলে বিশুদ্ধতা এসে যায়— ষড় রিপুর দাপট— কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ- মাদ-মাৎসর্য এ সবই মনকে আসুরিক চেতনার মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে। ভগবৎ চিন্তার ক্রম প্রবাহ এ সব আসুরিক প্রভাব থেকে মনকে নিষ্ক্রান্ত করতে এগিয়ে দেয়।

জ্ঞানযোগ—ব্যবস্থিতি-ভগবৎ পথে এগিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয় তবে একের পর এক উপায় চলে আসে এগিয়ে যাবার জন্য সে পথে। ঋষিগণ পঞ্চ ঋণের কথা বলেছেন ঃ দেব ঋণ-ঋষি ঋণ - পিতৃ ঋণ - নৃ ঋণ - ভূত ঋণ। এই ঋণ মোচনের জন্য ঋষিগণ উপায় বলেছেন। যজ্ঞ সম্পাদন, অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ নির্ভর গণ্ডী পেরিয়ে বৃহতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথাই ঋষিগণ বলেছেন। এজন্য মনের ক্ষেত্রকে ক্রমে বাড়িয়ে ভগবৎ উদ্দেশ্য করতে হয় নিবেদন।

দানের মনোভাব ও প্রবৃত্তি খুবই গুরুত্বের। দমঃ অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় সংযম। সবরকম পর্যায়ে সংযম প্রয়োজন। বাক সংযম, মনের সংযম সব ইন্দ্রিয়ের সংযম, প্রবৃত্তির সংযম দৈবী পথে এগিয়ে চলবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনের। সংযম যখন প্রবৃত্তি, ব্যবহার ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে চলে আসে সাধন পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা — এগুলি সাধন পথের জন্য জরুরী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সার্বিক উপদেশ দিয়েছেন। যজ্ঞ হল নিবেদন। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হল অহং নাশ। যজ্ঞের পটভূমিটি সর্বদাই নিজেকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। নিবেদনের ইচ্ছা-বিশ্বাস যতই গড়ে উঠবে, ততই এই যজ্ঞ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলবে। স্বাধ্যায়টি হল নিজেকে জ্ঞান অর্জন, আহরণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা নিজের অর্জিত অনুভূতি, উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধি ক্রম সঞ্চারে সত্যের অনুভব, বোধ এবং আকৃতিকে বাড়িয়ে তুলবে। এমন পটভূমিতে ধ্যানে মন বসবে। ধ্যানের গভীরে মন যতই ডুবতে পারবে ততই তার মধ্যে ভগবানের জন্য আকর্ষণ বাড়তে থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তপস্যার জন্য অনুকূল মন গড়ে তোলবার কথা বলেছেন অর্জুনকে। চারিত্রিক গুণের মধ্যে আর্জবম্ বা সরলতাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিলেন তিনি। চরিত্রে, স্বভাবে, বিশ্বাসে, কর্মে সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন সারল্য। মনের ও চরিত্রের মধ্যে সারল্য জীবের পক্ষে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বার উন্মোচনকারী। অর্জুন আর্জবমের প্রতীক। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা রূপে দেখেছেন, কিন্তু যখন বুঝলেন ইনিই সচ্চিদানন্দ; অর্জুন তার সারল্যের বিশ্বাসে গ্রহণ করেছেন।

দেবছন্দে ঃ তে হি দ্যাবাপৃথিবী মাতরা মহি দেবী।
দৈবাৎ অজঃ মূর্ত ঐ মনা যজ্ঞিয়ে জগতম্।
উভে বিভৃতঃ উভয়ং ভরিম্ অধিঃ।
পুরুঃ রৈবঃ স্বতঃ বিকাশম্ পৃথিবী চমন সিঞ্চতঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৪/১৪)

এসেছে এখন বিপুল আহ্বান আত্মার এই জাগরণের তরে।
যে মনে হয়েছে পৃথিবী মরুৎ জীবনের এই পথ প্রবাহে।
যা কিছু এসেছে চেতন প্রদীপ করে সংহত সময়ে
এখনই হয়েছে ক্ষণ ঐ দৃপ্ত ভাবপ্রবাহের সমান আবর্তে।
যজ্ঞের আহুতি হয়েছে দ্বার প্রণমে হয়েছে স্থিত দেববার্তায়।
এখন ক্ষণ ক্রম নিবেদনে গড়ে ওঠে মহাজীবনের চেতন পর্বে।
দেবতার প্রভা এসেছে এখনই জীবনের নিত্য প্রসারে এবার
এসেছে ক্ষণ দেবতার হয়ে ওঠে জীবনের নিত্য বিকাশের ছন্দ।

দেবতার আহ্বান হৃৎ চেতন আলোকে ঃ

বি যা হোত্রা বিশ্বম্ অপ্রোতিঃ বায়ুং।
বৃহস্পতিঃ অরমতিঃ পনীয়াস।
গ্রাবা যত্রঃ মধুসূদন এতৎ উচ্যতে।
বৃহৎ অবিবশন্তঃ মতিভিঃ মনীষিণঃ।। (ঋ. বে. ১০/১৪/১৫)

তোমারই দেওয়া ব্রতপথে চলেছে জীবনের এগিয়ে চলা সর্বত্র।
এখন ঐ অনন্ত চেতন হয়ে জীব প্রবাহে এসেছে সময়।
যে ভাবমূর্তি ব্রহ্মপথের সূক্ষ্ম সময়ের এই প্রবাহের পথে।
এখন জীবন মাঝে সখার সাহচর্যে হয়েছে মুক্তি।
যে ভাবদীপ্তি অন্তর পর্বে দাও চেতনের ব্যাপ্ত মহত্বে।
মানবের হৃৎ চেতনের অভ্যন্তরে হয়েছে দিব্য চেতন মাঝে।
মানব প্রকৃতির মাঝে ঐ পরম চেতনের বিদায় ক্ষণ প্রভায়।
মানব চিন্তার পটভূমি হয়েছে মুক্ত করে উন্মুক্ত হয়েছে সর্বত্র।।

অধ্যাত্ম বিকাশ ঃ দৈবীগুণের আরও যেসব দিক রয়েছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অহিংসা, সত্য পালন, ক্রোধহীনতা, ত্যাগের মনোভাব, অন্তরে প্রশান্তি, অন্যের বিষয়ে দোষ-অন্বেষণ ও চর্চা না করে, দয়াপরবশ মন, লোভহীনতা, মার্দব-অর্থাৎ, প্রতিসোধমূলক মৃদুতা বর্জন কোনরকম কুকর্ম বা কুচিন্তার মধ্যে নিজেকে লিপ্ত না করা আর চপল প্রবৃত্তি — অর্থাৎ অনাবশ্যক অতিকথন না করা।

অহিংসা সত্যম অক্রোধঃ ত্যাগ শান্তি অপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষু অলোলুপ্তং সার্দবং হ্রীঃ অচাপলম্।। (গী. ১৬/২)
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম অদ্রোহো ন অতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতস্য ভারত।। (গী. ১৬/৩)

অন্তরের শক্তি-চরিত্র বল, ক্ষমার দৃষ্টি, জগতের কর্ম ও জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পটভূমিতে ধৈর্য, সর্বদাই অন্তর ও বাইরের বিশুদ্ধতা পালন, বিদ্রোহীর মনোভাব ভগবত্তার প্রতি কোনও ভাবে হতে না দেওয়া, অহং এর দ্বারা গ্রাসিত না হওয়া — ছাব্বিশটি গুণ সমন্বিতভাবে দৈবীগুণ হিসাবে বর্ণনা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনকে উপদেশ দিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইসব দৈবীগুণ বরণ করে নিয়েই কর্মমার্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে দিব্য কর্ম করতে সম্পাদন।

দৈবীগুণ একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন তেমনি বিশেষভাবে প্রয়োজন ভগবানের কাজের জন্য যিনি চিহ্নিত তার জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছেন অর্জুনের মধ্যে এই দৈবী গুণের সঞ্চার হোক। শ্রীকৃষ্ণ আর্জবম্ ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে সারল্যকে চিহ্নিত করেছেন সবচেয়ে জরুরী দৈবীগুণ হিসাবে। অর্জুনকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুতপক্ষে অর্জুনই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভগবানের প্রতি ভক্তির পূর্ণতায় জ্ঞান ও কর্মের সংযোগ এসে যায়। অর্জুন যে কর্মপথে নিজেকে যুক্ত করেছেন সেটি ভগবানের চিহ্নিত কর্ম। সাময়িকভাবে প্রথমে বিষাদের প্রভাবে অর্জুন বিমূঢ় হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের বার্তা ও উপদেশ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে অর্জুন গ্রহণ করলেন এজন্যই অর্জুনের কাছেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ উন্মোচন করেন। অর্জুনই একমাত্র ভক্তপ্রাণ যার ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছে। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মধ্যে ছিল যা কিছু দ্বিধা, দ্বন্দ্ব; যা কিছু ভক্তির ঘাটতি সব পূর্ণ হয়েছে। অর্জুন ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ পেয়েছেন ভগবানের কাছ থেকে। ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ আত্মনিবেদন করলেন অর্জুন। দৈবী গুণান্বিত অর্জুন সবরকম সন্দেহ মুক্ত হয়েছেন; নিজেকে সমর্পণ করলেন ভগবৎ আজ্ঞাপালনে জীবন বিনিয়োগ করলেন অর্জুন।।

—ঃঃ—

অন্তরে শিব শক্তির জাগরণই ভগবান লাভ

তুলি চ্যাটার্জী

ঋষি সভ্যতায় ভগবৎ জীবন ছিল এক সাবলীল ঘটনা। ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করাই ছিল স্বাভাবিক। জীবন, ব্যক্তি পর্যায় হোক আর সমষ্টিগত ভাবেই হোক গড়ে উঠত ভগবানকেই কেন্দ্র করে। ঋষিগণই ছিলেন সমাজের প্রাণ কেন্দ্র এবং শীর্ষস্থান অধিকারী। সমাজের যে কেনো কাজে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বস্তরের মানুষই নির্ভরশীল ছিলেন ঋষির সিদ্ধান্তের উপর, সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ ব্যক্তি কেন্দ্রিক হোক, পরিবার কেন্দ্রিক বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, সব ক্ষেত্রেই ঋষির সিদ্ধান্তই ছিল বরণীয়। বৈদিক যুগে ঋষিগণ কোনো বিশেষ পদাধিকারী বা ক্ষমতাধিকারী ছিলেন না, যে তার জন্য সর্বস্তরের মানুষ ঋষির নির্দেশিত পথকে বেছে নিতেন। ঋষি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। অর্থাৎ ঋষি জীবনের মূল ভিত্তি ছিলো ভগবান আর ঋষির সিদ্ধান্ত ছিল ভগবৎ ইচ্ছার অনুসারী তাই সর্বস্তরের মানুষ ঋষির ইচ্ছাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতেন। ঋষি জীবন ছিলো অত্যন্ত সাধারণ এবং কর্মময়। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার কার্যাদি ঋষি স্বয়ং এবং ঋষির আশ্রমভুক্ত সব শিষ্য নিত্যই পালন করত। ঋষি সমাজ অন্তর্ভুক্ত একজন সত্ত্বা। ঋষিই ছিলেন একটি সমাজের ধারক। ঋষিই সমাজের ভিত্তিকে গড়ে দিতেন, ধারণ করে রাখতেন এবং এগিয়ে নিয়ে যেতেন। ঋষির আশ্রমে যে সব শিষ্যরা স্বাধ্যায় এবং অধ্যাস-এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতো তারাই পরবর্তীকালে সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করে সমাজকে চালনা করত এবং সর্বদাই গুরুকে অন্তরে ধারণ করে সেই মত জীবন যাপন করতো। এদেরই মধ্যে কেউ রাজা হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতো, এদেরই মধ্যে আবার কেউ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো কেউ আবার ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজের নানা কজে যুক্ত হয়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু যে যে কাজের মধ্যেই নিযুক্ত থাকুন না কেন প্রত্যেকেই ভগবৎ জীবনাশ্রিত হয়েই জীবন কার্য পরিচালনা করতেন। বেদ শিক্ষা রীতির মূল ছিল ভগবত্তা। ঋষি আশ্রমে বালক বালিকাদের চরিত্র গঠন করতেন। প্রতিটি বালক বালিকার জীবনের অভ্যন্তরে ভগবত্তার বীজ বপন করে দিতেন, সেই বীজকে লালন পালন করে প্রয়োজন ও আধার অনুযায়ী জীবন গঠন করে দিতেন আর এই ভাবেই সমাজের অভ্যন্তরে গড়ে উঠত দিব্য জীবন। ভগবানকে বরণ করে এগিয়ে যায় যে জীবন। তা কোনো সমাজ বহির্ভূত বিশেষ ছিল না।

বৈদিক যুগে চরিত্র গঠন ঃ— যে সব বালক বালিকাগণ ঋষির আশ্রমে জীবন নির্বাহ করত তারা সবাই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের এবং পরিবারের অংশ। তারাই আসতো ঋষির আশ্রমে, গুরুগৃহে থেকে পঠন-পাঠন করার উদ্দেশ্যে। বৈদিক যুগে গুরুগৃহে আবাসিক হিসেবে থেকে পঠন পাঠনের রীতি ছিল। এই রীতির মূল কারণ হল, সামাজিক বৈষম্যকে দূরীভূত করে সব শিক্ষার্থীকে একই রকম পরিবেশ, সুযোগ এবং সংস্থান এর মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে ওঠা। গুরুগৃহে বালক বালিকারা খুব স্বল্প এবং যথাযথ সংস্থানের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করতে। এই শিক্ষা পদ্ধতির দুটি মূল স্তম্ভ ছিল স্বাধ্যায় এবং অধ্যাস। স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিজ অনুভব এবং উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানকে নিজ অন্তরে ধারণ করা। এবং অধ্যাস হল জীবনের যে জ্ঞান আহোরিত হয়েছে সেই জ্ঞানকে জীবনের সাথে অন্বিত করে আরো বাড়িয়ে তোলা এবং জগৎকে নতুন জ্ঞান সম্ভাবের উপলব্ধি উপহার দেওয়া। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি জীবনই স্বয়ং নিজ অন্তরে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে নিজ নিজ জীবন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। তাদের জীবন ছিল কৃচ্ছসাধনে অর্থাৎ সুখ সুবিধার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা নয় কষ্ট করে, সুখ স্বাচ্ছন্দকে ত্যাগ করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা নেওয়া। গুরুর ভূমিকা ছিল সর্বোপরি। গুরু স্বয়ং প্রতিটি বালক বালিকাকে প্রতিটি মুহূর্তে পথ নির্দেশ করতেন, গুরু বক্তৃতা দিতেন এবং এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ঋষি স্বয়ং তার উপলব্ধির কথা সবার মধ্যে বিতরণ করতেন, গুরু প্রত্যেককে Assigunment (প্রদত্ত কর্ম) দিতেন যে কর্ম প্রতিটি বালক বালিককে নির্দিষ্ট গুণগত মান বজায় রেখে কর্ম পালন করতে হত। এই জীবন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি বালক বালিকার চরিত্র গঠন হত। চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশিত হত, চরিত্রের মধ্যে ঠিক ভুল বিচারের সূচনা হত এবং সেই ঠিক ভুল বিচারের মাপকাঠি ছিল স্বয়ং ভগবৎ ইচ্ছা। এই চরিত্রের মূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—(১) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, (২) দৃঢ় বাক্ সম্পন্ন, (৩) নিজ সুখ সুবিধার প্রতি উদাসীন (৪) অন্যের প্রতি যত্নশীল। দয়া পরবশ। (৫) ক্ষমাশীল, (৬) কর্মের প্রতি নিবেদিত, (৭) সহনশীলতা (৮) ধৈর্য্য বান (৯) দৃঢ় চেতা, (১০) ইন্দ্রিয় সংযম, (১১) সাহসী,

(১২) শ্রদ্ধাশীল, (১৩) ভক্তিমতি ইত্যাদি। এই রকম চরিত্রের মানুষই পরবর্তী পর্যায় সমাজের নানান দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং সমাজ পরিচালনা করতেন, তাই সেই সমাজের বৈশিষ্ট্যই হতো ভগবৎ কেন্দ্রীকতা।

অধিকার অনুসারে শিক্ষা এবং কর্মজীবনের নির্ধারণ ঃ—

সেই যুগে গুরু গৃহে আসা বালক বালিকারা কখনোই একই রকম শিক্ষা গ্রহণ করতো না। তারা একই রকম জীবন পদ্ধতির মধ্যে থাকলেও তাদের শিক্ষা গ্রহণের বিষয় বস্তু নির্ধারিত হত তাদের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে। এই অধিকারটি নির্ধারিত হত তাদের অর্ন্তবস্তুর উপর নির্ভর করে, বংশানুক্রমিক ভাবে নয়। অর্ন্তবস্তু অর্থাৎ প্রতিটি জীবনে এক একটি ধারা থাকে, যে ধারা ভগবানের কৃপায় সম্ভবনা রূপে ব্যক্তির প্রকৃতির সাথে অন্বিত হয়ে আছে। সেই সম্ভাবনা অনুযায়ী ব্যক্তির নিজ নিজ শিক্ষার অধিকার গড়ে তোলে এবং সেই পথেই শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারদর্শি হয়ে ওঠেন। এবং সেই শিক্ষাই ব্যক্তিকে কর্মজীবনে স্থান করে নিতে সাহায্য করে। এই শিক্ষাই ব্যক্তি কর্ম পরিচয়কে নির্ধারণ করে। যেমন ঋষি গৌতম, সত্যকামের বালক অবস্থায় তাকে একশ অসুস্থ গাভীর সাথে বনে যাওয়ার এবং তারা সুস্থ ও বলবতী এবং সংখ্যায় এক সহস্র হলে তবে ফিরে আসার যে কর্ম দিয়েছিলেন তা অন্য কোনো শিষ্যকে দেননি। আবার একই ভাবে সত্যকাম ও যখন ঋষি অবস্থায় সবাইকে ব্রহ্মজ্ঞানে আখ্যায়িত করে সমাবর্তন এর সমাপ্তি ঘোষণা করলেন আর উপকৌশল যে কিনা সর্বাধিক যোগ্য শিষ্য তাকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সমাজে। তার ঋষি সমীপে থাকার মেয়াদ আরো দীর্ঘায়িত হল। ইন্দ্র এবং বিরোচন দুজনে একই সাথে ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করতে গেলেন বিরোচন তেত্রিশ বছর পর ফিরে এলেন কিন্তু ইন্দ্র এর মনে জিজ্ঞাসা জাগল তাই তিনি ফিরে গেলেন এবং আরো সত্তর বছর অতিবাহিত করলেন, গুরুর কাছে এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে ফিরে এলেন। পঞ্চ পাণ্ডব একই বংশস্রোত এবং একই গুরুর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও, গুরু দ্রোণ বুঝেছিলেন যুধিষ্ঠির ন্যায়, জ্ঞান ও রাজনীতি শিক্ষার উপযুক্ত, ভীম বল প্রয়োগে, অর্জুন যুদ্ধনীতি ও ধনুর্বিদ্যা এবং নকুল ও সহদেব পশু পালনে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে উপযুক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ উদ্যোগ, যোগ্যতা এবং সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে গড়ে তুলতেন নিজ নিজ শিক্ষার ক্ষেত্র এবং গুরু তাঁকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেন। কিন্তু যে, যে শিক্ষা রীতির মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠুক না কেন, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল, সব রকমের কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানকে উপলব্ধি করা এবং ভগবানকেই অন্তরে ধারণ করে কর্ম সম্পাদন করা। ভগবানে নিবেদিত কর্মই হয়ে উঠত সমাজের কাঠামো। গুরু গৃহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পঠন পাঠন শেষ করে প্রতিটি বালক বালিকা সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এবং তারা এক একজন সমাজের এক একটি বিষয় পারদর্শী হয়ে উঠতেন। কেউ রাজ্যশাসন করতেন, কেউ যুদ্ধ করতেন, কেউ বাণিজ্যে নিযুক্ত হতেন আবার কেউ কৃষিকাজ এবং সমাজের অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত হতেন। এভাবেই ঋষির আশ্রমে বালক বালিকারা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা পেত এবং সমাজের মধ্যে এসে সমাজের ধারক ও বাহক হয়ে উঠতেন। ভগবানকে হৃদয় ধারণ করে যে সমাজ পরিচালিত হত সেই সমাজের কেন্দ্র বিন্দুতেই অবস্থান করতেন ভগবান স্বয়ং।

কর্ম থেকে ধর্ম নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে সমাজ গঠন ঃ—

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাই ছিল কর্ম চয়নের ভিত্তি। আর সেই কর্মই গড়ে দিত মানুষের ধর্ম। ধর্ম অর্থাৎ বৈশিষ্ট। যে যে কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন সেই কর্মই তাঁর পরিচয় নির্ধারণ করে দিত। সেই পরিচয়ই হয়ে উঠত ব্যক্তির ধর্ম এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হত ব্যক্তির পালনীয় কর্তব্য। কর্মই নির্ধারণ করে দিত সেই ব্যক্তির ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ভুমিতে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মোট ১৮টি অধ্যায় যোগ শিক্ষা দিলেন, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থেকে জগৎ-কর্ম নির্বাহ করার পাঠ দিলেন। এই পাঠ দেওয়াকালীন ভগবান উল্লেখ করেছেন ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা অর্থাৎ একজন যোদ্ধার কী ধর্ম হওয়া উচিত। যোদ্ধর কর্তব্য, যোদ্ধার চরিত্র, যোদ্ধার মনভূমি এবং যোদ্ধার নিবেদিত কর্ম সম্পাদনের উপায় ব্যক্ত করেছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম ছিল ব্যক্তির কর্মের অধিকার এবং কর্মের অধিকার অনুসারেই বৈশিষ্ট্য নিরুপনই ছিল ধর্ম পালন। এই ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হত ব্যক্তির প্রকৃতি। এই ধর্ম কোনে ব্যক্তিই বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত হতেন না, যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হতেন। আবার সন্তানের মধ্যে যদি বাবা মায়ের পালিত ধর্মের প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকত তবে তারা সেই ধর্ম ও প্রাপ্ত হতেন। বৈদিক যুগে ধর্ম, জ্ঞান অথবা ভাবের উত্তরাধিকার ছিল গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, যোগ্যতার ভিত্তিতে। যে যখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবন কার্য পরিচালন করছেন, সেই সময়ের নিরিখে তার পালনী কর্তব্যই ছিল ব্যক্তির ধর্ম। মানুষ হিসেবে, সন্তান হিসেবে, সংসার জীবনে, সর্বত্র করণীয় কর্তব্য পালনই ছিল ধর্মপালন, আর এই ধর্মের ভিত্তি হল ভগবত্তা। ভগবৎ ইচ্ছাকেই

শীরধার্য করে, ভগবৎ দৃষ্ট প্রাপ্ত মনের বিচারই একমাত্র হয়ে উঠতে পারে ভগবৎ অভিসারী। যে কর্মের উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং এবং কর্ম পদ্ধতি ও ফলাফল ভগবানে নিবেদিত সেই কর্মের গতি, ধর্ম, প্রত্যয় এবং কর্তব্য সবটাই ভগবত্তায় বিধৃত। তাই কর্মের মধ্যে দিয়ে যে ধর্ম গড়ে ওঠে সেই ধর্ম ও ভগবত্তায় অন্বিত হয়ে থাকে। এই ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থাও ভগবান কেন্দ্রীক।

সাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ— বৈদিক সভ্যতায় প্রত্যেক ব্যক্তি, তার ব্যক্তি জীবনে ভগবানকে বরণ করেই নিত্য কর্মে ও ধর্ম পালনে নিযুক্ত হতেন। তাই সমষ্টিগত ভাবেও এই ভগবৎ ভাবকে বরণ করেই এগিয়ে চলতেন সব প্রাণ। এই জীবন ধারায় কয়েকটি বিশ্বাস সর্বাধিক গুরুত্ব পেত। (১) জীবন সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। (২) ভগবৎ ভাবই সত্যের নির্ধারক, (৩) সত্যের মাপকাঠিই বিচারের মাপকাঠি। (৪) ভগবৎ জ্ঞানই জীবনের দৃষ্টি, শ্রুতি ও বাকের উৎস। (৫) কর্মের প্রেরণা, গতি ও উদ্দেশ্য ভগবৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই সমাজ ব্যবস্থা বিন্যস্ত ছিল পঞ্চ ঋণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। এই তত্ত্ব মানুষকে এই জ্ঞান প্রদান করে যে, এই প্রতিটি জীবন বিভিন্ন রকম ভাবে বিভিন্ন উৎসের কাছে ঋণী। জীবন দেবতাগণের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছেন এই জীবনের এবং জীবন ধারণের নানা উপকরণের (জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমি, ব্যোম) জন্য যা দেবঋণ হিসেবে পরিচিত। জীবন ঋষিগণের কাছে ঋণী রয়েছে এই জ্ঞান, ভগবৎ জ্ঞানের জন্য, যা ঋষিরা স্বয়ং তাদের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং দান করেছেন এই জীবনের চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য। এই ঋণ ঋষি ঋণ হিসেবে পরিচিত। জীবন তার পূর্বপুরুষগণের কাছেও ঋণী হয়ে রয়েছে জীবনের সমস্ত গুণাবলী, সমস্ত প্রকার সংস্কারের জন্য যা জীবন বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত হয়ে চলেছে, এই ঋণ পিতৃ ঋণ নামে উল্লিখিত। জীবন সমগ্র মানব সমাজের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছেন কারণ প্রতিটি জীবনই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। কোনো জীবনের অস্তিত্বই সাতন্ত্রে গড়ে ওঠেনি। প্রত্যেকেই জীবন ধারণের জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যিনি মাঠে ফসল ফলান তিনি তাঁতে সুতো বোনেন না কিন্তু জীবন ধারণের জন্য অন্ন-এর যেমন প্রয়োজন বস্ত্রের ও প্রয়োজন। তাই জীবনে এই নির্ভরতার মধ্যে দিয়েই সমাজ জীবনের সূচনা হয়, এই ঋণ, নৃঋণ নামে পরিচিত। জীবন মানবেতার জীবনের কাছে ও ঋণী হয়ে রয়েছে তার জীবন ধারণের জন্য। এই জীবন ধারণে পর্যায় পর্যায় মানবেতর জীবনগুলি মানব জীবনের অস্তিত্বকে ধারণ করে রেখেছে। এই ঋণ ভূত ঋণ নামে পরিচিত। এই বোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠত মনগুলি যে মন নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অন্যের উপর অধিকার না করে, উদার মনের পটভূমিতে দান করতে শিখত। যে মন জানত যে সে তার জীবনের জন্য সবার কাছে ঋণী সেই মন তার ঋণী মোচনের জন্য হয়ে উঠত প্রয়াসী। সে তার অহংকে দান করে গড়ে তুলতো নির্মল মনের পটভূমি। সে পটভূমি জন্ম নিতো করুণা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, হিতাকাঙ্খা, ভগবৎ আস্পৃহা, এই শ্রদ্ধাশীল সত্যের প্রতিষ্ঠিত জীবন মাঝে ফুটে উঠত ভগবৎ জ্ঞান। ভগবৎ উপলব্ধি জীবনের বোঝাকে পরিপূর্ণতায় করত বিদ্ধৃত। জীবনের চিন্তায়, জ্ঞানে, ধ্যানে ভগবৎ স্পর্শ জীবনকে করে তুলতো ভগবৎ পিপাসু, ভগবৎ পিপাসু প্রাণ ভগবানকে হৃদয় ধারণ করে জীবন নির্বাহ করতো। জীবন উপলব্ধি করত যে ভগবান স্বয়ং দ্রষ্টা, সাক্ষী এবং কর্তারূপে জীবনের মাঝে বিরাজিত হয়ে আছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দ্রষ্টা রূপে অবলম্বন করে চলেছেন। সাক্ষীরূপে কালের স্রোতে অন্বিত করে নিয়েছেন জীবন সব ভাবনা, চিন্তা, কর্ম, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব, সবকিছুকে, আবার সেই ভগবৎ সত্তাই জীবন মাঝে হয়ে উঠেছেন কর্তা যখন জীবন চেয়েছে তাকে একান্তে, আপনত্বে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁরই হাত ধরে তাঁরই উদ্দেশ্য। তখন তিনি জীবন রথে রথারূঢ় হয়ে জীবন রথকে করেছেন চালনা। জীবন যখন বুঝেছে তিনি আছেন অন্তরে সন্নিবিষ্ট হয়ে তখন জীবন জেনেছে যে তার অবস্থান সর্বত্র, সর্বজীবনের, সর্ব অস্তিত্বের অভ্যন্তরে, তাই তখন জীবনের দৃষ্টি হয়েছে উন্মুক্ত। জীবন বুঝেছে যে এই তার অস্তিত্ব সব অন্তরে অন্তরে, কোষে কোষে, তিনিই হয়ে আছেন সবকিছু। অনুমাত্রায় এবং স্থূলমাত্রায় তাঁরই প্রকাশ। তখন তিনি জীবন বোধকে এই ভেদবিচারের গণ্ডি থেকে করেছেন মুক্ত, দিয়েছেন তার জ্ঞান সম্ভার, যে জ্ঞান জীবন লালন করেছে অন্তরে করতে অনুভব তাঁকে, বুঝেছে তিনি সর্বময়, প্রতিষ্ঠা হয়ে সাম্যের, প্রকৃতার্থে জীবন বুঝেছে সাম্যই বিরাজিত সর্বত্র, সর্বাবস্থায়। জীবনে জীবনে, আপাত জড়ে, প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ব্যক্তি জীবনে, ব্যক্তি হৃদয়, সমষ্টিতে। এই ছিল মূল বিশ্বাসের পটভূমি বৈদিক সভ্যতায়।

স্বরাট গঠন ঃ— বৈদিক সভ্যতায় জীবন ছিল সমাজভুক্ত, জীবনের সব কার্যাদিই ছিল সাবলীল। জীবন চতুরাশ্রমে ছিল বিভক্ত। নানা পর্যায়-এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেও জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এক এবং একমাত্র। তাই কর্মের প্রেক্ষাপট, জীবনের পরিচয়, অবস্থান, চলার মাধ্যম কোনোটি মূল ছিল না। মূল ছিল একমাত্র তার অন্তরের সাধন, প্রতিটি জীবন তা সে রাজার রূপেই হোক আর

ভিক্ষুকের রূপেই হোক ছিল যোগ্যের বেদী। জীবন ছিল সাধক, আর জীবনকে ধারণ করে থাকা ব্যক্তি পরিচয়টি ছিল সাধক, সাধকের কোনো আলাদা পরিচয় ছিল না কারণ প্রতিটি জীবন-ই এক একটি সাধন জীবন হয়ে উঠত। সাধন ছিল অন্তরে, নিজের মধ্যে সবকিছুর মধ্যে, সবার মাঝে, ভগবানকে ধরে থাকা, ভগবৎ ভাবকে আশ্রয় করে থাকা, ভগবৎ ভাবে লীন হয়ে জীবন এগিয়ে চলত ভগবৎ ছন্দে। প্রতিটি জীবনই এই পর্যায় সতন্ত্র। সমাজভুক্ত কিন্তু সমাজবদ্ধ নয়। জীবন চিন্তায়, উপলব্ধিতে, বিশ্বাসের মাত্রায়, জ্ঞানের আলোয় নিজ নিজ যাত্রা পথে এগিয়ে চলত। সম্মান করতো পারস্পরিক বিনিময়কে কিন্তু গড়ে উঠত না দুর্বল নির্ভরতা। প্রতিটি জীবনই ছিল স্বরাট। জীবনের সব ষড়ঋপুর বন্ধনকে পেরিয়ে, আবেগকে সংহত করে জীবন উত্তীর্ণ হত একাগ্রতায়। একাগ্র মন হয়ে থাকত সর্বদা নিবেদিত ভগবৎ চরণে এ জন্য জীবনে এক অন্য উত্তরণ। জীবন সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনো কিছুর দ্বারাই প্রভাবিত নয়। সব আবিলতাকে পেরিয়ে জীবন চলেছে ভগবৎ শক্তিতে ভর করে। ভগবৎ আশ্রিত জীবন, এক নির্ভিক, জীবন যে জীবন কোনো কিছুর জন্যই কাতর নয়, অপেক্ষমান, স্বনির্ভর, স্বরাট। এই স্বনির্ভরতা মানে, নিজের অহং-এর উপর নির্ভরতা নয়। অন্তরে বিরাজমান ভগবৎ সত্তর উপর নির্ভরতা।

দিব্য জীবন বরণ ও পালন ঃ—

বৈদিক যুগে এই স্বরাট জীবন যেন এক অন্য রকমের জীবন। যে জীবন বাইরে জগৎ-এর সব কার্যে নিযুক্ত আবার অন্তরে সবকিছুর প্রতিই নিরপেক্ষ। সদা কর্মময় হয়ে আছে অথচ কর্মের প্রতি নিরাসক্ত। সর্বক্ষণ গতিময় অথচ অন্তরে স্থির, নিঃস্বঞ্চল। সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু কোনো ঢেউই তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। তিনি সমাজের পরিচয় পরিচিত আবার তার কোনো পরিচয়ই নেই। তিনি অনেক সম্পর্কে সম্পর্কিত কিন্তু তাঁর কোনো আত্মীয় নেই। তিনি সদা ব্যস্ত কিন্তু কোনো কর্মের অধিকার নেই যেন সব সময় সব কিছু দান করে চলেছেন, কিছুকেই যেন তিনি ধরে নেই। তাঁর কিছুই নেই অথচ তাঁর থেকেও বড় দাতাও কেউ নেই। যে মুহূর্তে তিনি উৎপাদন করেন সেই মুহূর্তেই তা দান করে। নেই তার এক ফোটাও সংরক্ষণ। তিনি সদা ধ্যানময়, অঞ্চল অবস্থায় চলমান হয়ে আছেন, তিনি যেন স্বয়ং তাঁকেই আরাধনা করে চলেছেন, তিনিই ভক্ত আবার তিনিই একই দেহে স্বয়ং ভগবান স্বরূপ হয়ে রয়েছেন। তিনি এই জগৎ মাঝে রয়েছেন কিন্তু জগৎ-এর কেউ হয়ে নেই। তিনি দিব্য জীবনের অধিকারী আর সর্বক্ষণ করে চলেছেন ভগবৎ কর্ম। পালন করে চলেছে সব কর্তব্য, বহন করেছেন জগৎ ভাব তার উন্নতি কল্পে। সদা নিবেদিত আনন্দময় জীবন, জগৎ কল্যাণে অতিবাহিত করে চলেছেন।

এই ছিল বৈদিক জীবন প্রণালী ও ভগবৎ কেন্দ্রীকতা। হে প্রভু সূচনা করো সেই সত্য যুগের, গড়ে তোলো ঋষি জীবনে প্রতিটি জীবনের অন্তরে অন্তরে। শিবশক্তির হোক উন্মোচন জীবন মাঝে।

নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়।

—ঃঃ—

রাজা হতে চাই না

ভক্তিপ্রসাদ

পথের ভিখারীর মনে অনেক আনন্দ। নিজের ধন আগলে রাখার কোনো দায়বদ্ধতা তার নেই। তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কাউকে খুশি করার কোনো ব্যর্থ প্রচেষ্টা তার নেই। মনে কোনো দুঃখ নেই। খোলা আকাশ এর নিচে পথের ধুলায় শুয়ে থাকার আনন্দ এ মশগুল সে সদা সর্বদা। এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এর অংশীদার সে। মাঝে মাঝে লোভ হয় এটা ওটা খাবার। মনে হয় গরমকালে ঠাণ্ডা ঘরে নরম গদিতে শুতে। মনে হয় কনকনে ঠাণ্ডা পরিবেশে একটু গরম আবহাওয়ায় কালাতিপাত করতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় যে সে তো ভিখারী। তার তো কোনো লোভ থাকার কথা নয়। পায়ে হেঁটে চলাই তো তার জীবন। সে স্বাধীন। তার কোনো পিছু টান নেই। হারানোর বেদনা তাকে কখনো গ্রাস করতে পারে না। কারণ তার তো নতুন করে হারানোর কিছু নেই। তবে মনুষ্যত্ব হারানোর ভয় সে পায়। কারণ সেটাই তার একমাত্র অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদকে আগলে রাখার স্বপ্ন সে দেখে। তার মানব জীবনের স্বার্থকতা সেখানেই। তাই সে রাজা হতে চায় না। এমনকি অভিনয়ের খাতিরে এক মুহূর্তের জন্যও রাজা সাজতে চায় না।

আসলে রাজার ক্ষমতা, দাম্ভিকতা, ধন দৌলত এর প্রাচুর্য, লোকবল, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, বিলাসব্যসন এসব তকে কিছুটা হলেও বেসামাল করে তোলে। তার মনুষ্যত্ব এবং মূল্য বোধ কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে যায়। সাধারণ হতদরিদ্র মানুষ তার নিজের মধ্যে যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই তা সে ভুলতে বসে। সে ভুলে যায় যে এই পৃথিবীতে তার অবস্থান দুদিনের জন্য। দেহ থেকে প্রাণপাখি বেরিয়ে গেলে একটা অতি সাধারণ মাটির পুতুল আর তার দেহের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আলাদা করে কোনো মর্যাদা পাওয়ার কোনো আশা থাকবে না। কেউ মানুষ বলে কোনো স্বীকৃতি দেবে না। তখন চুল্লীতে প্রবেশ অথবা কবরে শায়িত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মনের হাজার হাজার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষের সেখানেই সমাপ্তি। এই চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি মানব মনে চেতনা সঞ্চার করে হলেন কল্পতরু।

কল্পতরু এক অচিন্তনীয় দিব্য বৃক্ষ। এই গাছের নিচে এক পথ ক্লান্ত পথিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রচুর ভালো ভালো খাদ্য পায়, বিশ্রামের জন্য সুন্দর সজ্জা পায়, পদ সেবার জন্য সুন্দরী রমণীর সাহচর্য লাভ করে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা বাঘ আসলে কেমন হয় এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ এসে তাকে হালুম করে খেয়ে নিতে পারে। তাই শ্রীশ্রী মা সারদা আমাদের বলেছেন বাসনা ত্যাগ করতে। শ্রীশ্রী ঠাকুর আমাদের আশীর্বাদ করেছেন যাতে আমরা চৈতন্য লাভ করি। অহংকার আর লোভের আক্রমণে জর্জরিত মানুষ কখনো কখনো দুর্বল মানুষের সর্বনাশ করতে চায়। অসহায় মানুষকে সাহায্য করে সে একসময় দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না যে সে ওই অসহায় মানুষকে একদিন সাহায্য করেছিল। সুযোগ পেলেই তাকে সে মনে করিয়ে দেয় সেকথা। কোনো সহজ, সরল সহকর্মীর ঘাড় ভেঙে ভালো মন্দ খাওয়ার ইচ্ছা সে ত্যাগ করতে পারে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কিছুর বিনিময়ে মানুষ অপরকে সাহায্য করতে চায়। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া মানুষকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা কখনো কখনো কোনো কোনো মানুষের সহজাত ধর্মে পরিণত হয়ে যায়। তাদের চৈতন্য দান করে গেলেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব। বলে গেলেন টাকা মাটি মাটি টাকা। বলে গেলেন কাঁচের বাতির ভেতরে যেমন সলতে জ্বলে তেমনি মানুষের ভিতরে জ্বলছে বিবেক রূপ প্রদীপ। এই প্রদীপের আলোয় যখন মানব মন প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন সাধারণ মানুষ পরিবর্তিত হয়ে ভক্তে রূপান্তরিত হয়। তার দেহ, মন পবিত্র হয়। সে শুচি শুভ্র হয়ে ওঠে।

—ঃঃ—

বিশুদ্ধ মনে করি আবাহন ভগবানে

সায়ক ঘোষাল

জীবনের প্রতিটি ক্ষণই এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা করে। উষার সূর্য যেমন প্রতিদিন নিয়ে আসে এক নবীন বার্তা যেমন প্রতিটি জীবনকে প্রাণদায়ী করে তোলে প্রতিটি জীবনকে যেমন এক পবিত্র সূচনার সুযোগ করে তোলে ঠিক তেমনই জীবনের যখন ভাগবতী প্রভার আবির্ভাব হয় জীবনে তখন নিজের সূর্যের আলোক স্বত্তার হদিশ পাওয়া যায়। ভগবৎ ভাব তখনই আবির্ভুত হয় মনে, যখন মন একা শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়। তখন ধীরে মনে সেই ভাব উন্মোচনের মাধ্যমে মন তার অন্তরের দেবসূর্যকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এখন মনের এই অবস্থার তার আপন পটভূমি। এই অবস্থাই হল সেই অবস্থা যা মনের উদ্দেশ্য, যেখানে মনের থাকার কথা। ব্রহ্ম উপলব্ধি তখনই আসবে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আকর্ষণ ঘটবে। ভগবানকে জানার ইচ্ছাই ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রথম ধাপ। যার একবার ভগবানকে জানবার ইচ্ছা হয়েছে জগতের যত বাধাই আসুক সে ঠিক ব্রহ্মলাভ করে থাকে কিন্তু বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি সেই সব বাধাকে বাধা বলে গ্রাহ্য করতে দেয় না। সময় সময়ের মতো করে এগিয়ে চলে যাবে। ভবিষ্যতে কী হবে, কীভাবে হবে তার জন্য এখন মিছে ভয় পেয়ে সময় নষ্ট করবো কেন। সময় যেমন আসবে সেরকম চলেও যাবে। জগতের প্রতিটি মুহূর্ত যেগুলো জীবনের সাথে জড়িত সেগুলি অতিবাহিত হয়ে যাবে। যখন যেটা হবার ঠিক হয়ে যাবে। যার যেটা পাবার সে সেটা পেয়েই যাবে। কিন্তু সর্বশেষে একটাই বিষয় প্রভাবিত সেটি হল কর্ম। যেটি শুধুমাত্র বর্তমানেই করা যাবে। কর্ম অতীত না ভবিষ্যতের করা যায়। বর্তমানে কর্ম করব যা তার ফল হয়ত ভবিষ্যতে আছে, কিন্তু যেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ আছে সেটা হল বর্তমান। জগতে সব কিছুই স্বাভাবিক, কিছু বিশেষও নয় আবার কিছু সাধারণও নয় তাহলে কেন এত প্রভাবিত, এটিই হল জগতের খেলা কারণ জগত আমাদের নিয়ে খেলে। জগতকে জগতের মতো রেখে নিরপেক্ষ ভাবে, নির্ভয় কর্ম করে যাওয়াটাই শ্রেয় তাহলেই কর্মের মাধ্যেমে ভগবান লাভের পথ আরও সুদৃঢ় হয়ে যাবে। সবকিছুকে ফেলে রেখেছিল

অর্জুন। সবকিছু হারিয়েছিল, জগতের ভয় নিজের মনোবল, নিজের প্রতিবিম্ব, ভরসা, অতিরিক্ত চিন্তা, বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু সে ভগবানের ওপর বিশ্বাস ধরে রেখেছিল। সে ঠিক জানত ভগবান তকে এই দুর্দশা থেকে ঠিক বের করে আনবে এবং আলোর পথ দেখাবেন। তাই অর্জুন নানা বাধার মধ্যে পড়লেও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ছিল তার অটল ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং ভালোবাসাই তাকে অজেয় করে রেখেছে। তাই জীবনে প্রতিটি বাধা এক একটি পর্ব যেগুলি সূচীপত্রের মতো জীবনে গ্রথিত আছে। তাই বাধা থাকবে বলে কি ভগবানের বিশ্বাসও চলে যাবে? তাহলে তো জিনিসটা দেনা পাওনা চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার হয়ে গেল। জীবনে সুখ দুঃখ বাধা বেদনার। সাফল্য, ব্যর্থতার পর্ব থাকতেই পারে কিন্তু আমাদের মনে পরম ব্রহ্মের প্রতি ভালোবাসা থাকবে অটল, শর্তনিরপেক্ষ এটিই হল সরলতা। আর সরলতা ভক্তিকে আরও দৃঢ় করে তোলে। সরলতাই বিশ্বাসের জন্ম দেয়। কোনো কিছুর থেকে ধীরে ধীরে মন তখন হয়ে ওঠে অপ্রভাবিত, সরল, শুদ্ধ ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহ কারি মন তখন হয়ে ওঠে এক বটবৃক্ষ। আর এই মনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিও ভগবৎ পথে প্রভাবিত হতে তৎপর হয়। এই রকম কর্মযুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মনই একজন প্রকৃত ভক্ত হয়ে ওঠে এবং সে পরম ব্রহ্মের সবথেকে প্রিয় ভক্তদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠে।

—ঃঃ—

সাধন বিস্তার ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ পথ

মানবেন্দ্র ঠাকুর

ভগবান যখন মানুষ হয়ে আসেন, সেই রূপটি কেমন হয়, তার কিছু কিছু ছবি আমরা তাঁদের লীলা অনুধাবনের ভিতর দিয়ে পাই। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন তাঁরই লীলা পার্ষদরা। শ্রীভগবানের লীলায় তিনি রূপময়, গুণময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তিনি দিব্য সত্তা, তিনি স্বর্গীয় আনন্দ ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। কিন্তু ভগবানের আরেকটি সত্তা আছে। সেটি হল অরূপ অনন্ত সত্তা। 'অনন্ত'। মানুষ কী করে ভাববে? মানুষ যে খুব ক্ষুদ্র, মানুষ যে খুব সীমিত। মানব সত্তার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হচ্ছে জৈবিক, শারীরিক। দ্বিতীয় মন-বুদ্ধির স্তর। তৃতীয় স্তর আধ্যাত্মিক। মন-বুদ্ধির স্তরে নানা মাপের মানুষ আমরা আমাদের সমাজে দেখি। অনেক বড় বড় মানুষ দেখি, তাঁদের সম্পর্কে জানি। ইতিহাসে পুরাণে বর্ণনায় অনেক বড় বড় মানুষের ছবি পাই। কিন্তু অনন্তকে কীভাবে দেখা যাবে বা পাওয়া যাবে? এর উত্তর খুঁজতে হবে মানব সত্তার তৃতীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্তরে। মন ও বুদ্ধির পরিধি একটা সীমার রাজ্য পর্যন্ত। সীমার রাজ্য ছাড়িয়ে মানুষ কীভাবে অসীমে যাবে সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। যাঁরা সসীমের অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হয়ে অনন্তকে অনুভব করেন, এমন সাধকরা আমাদের অনন্তের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন একজন সাধক কবি-স্বামী প্রেমেশানন্দজী, শ্রী শ্রী মায়ের কৃপা ও আশীর্বাদ পুষ্ট শিষ্য তাঁর একটি গানে অসীমের রূপাভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা গান রচনা করেন তাঁরা কবি, যাঁরা গান করেন তাঁরাও কবি। সাধক কবির গান দিব্য ভাব ও অনুভূতির স্পর্শ এনে দেয় শ্রোতার হৃদয়ে। একটি এমন গানের প্রথম দু-টি লাইন কতই না মাধুর্যপূর্ণ!

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাভায়
আদি অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়।

গানটি প্রথম এই দুটি চরণের মধ্যে কবি একটি বিশাল ভাবকে প্রকাশ করেছেন। তিনি, যিনি আদি অন্তহীন, করুণায় মানবকায়া ধারণ করেন। অনন্ত ভগবানের স্বেচ্ছাকৃত ক্ষুদ্ররূপ স্বীকার করা। যখন মানুষ সাধনায় তাঁর সীমাবদ্ধ তাকে অতিক্রম করেন, তখন ভগবানের করুণা-মমতায় মানবকায় ধারণ করার গূঢ় রহস্য অনুভব করতে পারেন। কবি গানে 'মায়ায়' বললেন এজন্য যে, ভগবান রূপ-অরূপের লীলায় বাঁধা পড়েন না। মায়ার যথার্থ তাৎপর্য হল যা তিনকালে সত্য নয়, এমন যা কিছু, তাকেই মায়া বলা হয়। জগতের সৃষ্ট বস্তু বিনাশী, তাই জগৎ তিনকালে সত্য নয়। জগৎ বিশাল, তবুও বড়ই ছোট। এই নীহারিকাতে অসংখ্য সৌর জগৎ আছে এবং তার মধ্যে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। কিন্তু সবই সীমিত। বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে অনেককাল থেকেই জগতের অনুসন্ধান করে চলেছেন, কিন্তু মহাকাশের শেষ সীমা নিরূপণ করতে পারেননি আজও। ধ্যানে মন মহাকাশ মহাবিশ্বকে ছাড়িয়ে রূপ-অরূপের সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করতে সক্ষম। মনের অনন্তে লয় পাওয়াকে বেদান্তে নির্বিকল্প সমাধি বলে।

বেদবিজ্ঞানী মাননীয় রমাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত গ্রন্থে বেদ বিজ্ঞানের গভীরে তত্ত্বে; প্রকাশে লিখিত 'সাধন বিস্তার'

বিষয় থেকে আমরা পেয়েছি যে সাধনার গভীরে প্রবেশ করে সাধক জগৎ ব্যাপী হয়ে ওঠেন। অনুভব যত গাঢ় ও গভীর হতে থাকে ততই এক থেকে বহু এবং সমগ্রতে দৃষ্টি চলে যায়। এক থেকে সমগ্রতে এগিয়ে যাওয়া এই দৃষ্টির ব্যাপ্তি ব্যক্তির জীবন সীমাকে বাড়িয়ে দেয়। এমনভাবে জীবন সীমা পরিবর্দ্ধিত হয় যে সাধকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি সমগ্রতা নিয়েই হতে থাকে।

যান্ রয়ে মর্তান সুযুদো
অগ্নেতে স্যাম মধবানো বয়ংচ।
ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসাক্ষী—
অপাবৃবান্ রোদসী অন্তরীক্ষম।।

তোমারই কৃপার পরশে হয়েছে প্রেরণা জগতে
যেমন চেয়েছ জীবনের করে তুলতে বরণ
তোমার ভাবে তোমারই অনুভবে করতে বরণ
তোমার একান্ত ভাবে জগতের পটে করে শরণ
তোমারই এই অকুণ্ঠ দানে হয়েছে জগৎ জাগরণ
এখনই করতে বরণ তোমায় এই পরম মিলনে।
তুমি হয়েছো বিস্তৃত জগতের সব অঙ্গে
নিত্যই আহ্বানে ভাবের প্রবাহে চিত্ত আকর্ষণে।।

সাধন পথে সাধকের বিস্তার ও ব্যাপ্তির বোধই ব্রহ্মপথে এগিয়ে যাওয়া। যতই ব্যাপ্তি ও বিস্তার ঘটবে মনে ততই তার প্রভা ফুটে উঠবে হৃদয়ে মনে প্রাণে। সাধকের সাধন পথে আসে নানা বাধা। হয়ে থাকে কত বিচিত্র ধরনের প্রতিরোধ। আসে নানা প্রকারের, নানা বৈচিত্রের ব্যাপ্তি। ব্রহ্মপথের আকর্ষণ যদি মনে আসে তবে আসতে পারে নানা ধাপের আবর্তন। যদি ঐ সব আকর্ষণ জীবনের সব পর্বে একের পর এক এগিয়ে আসে তবে জীবন বৃত হয় নবীন আবর্তে। একটির পর একটি-বাধাকে অতিক্রম করে যখন এগিয়ে যায় জীবন পথে, ক্রমে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে জীবন। সাধন পথে এগিয়ে আসাই ভাগবতী কৃপা। ব্রহ্ম বিষয়ে যখনই আসে মনে আকর্ষণ তখনই এগিয়ে আসে অনুভবের বার্তা। ব্রহ্ম বার্তা হৃদয়ে মনে প্রাণে এসে নতুন মাত্রা যোগ করে। ব্রহ্ম বার্তা জীবনের সব অঙ্গে প্রবেশ করে জীবনকে মুর্ত করে তোলে। একটির পর একটি অনুভবের সংবেদ জীবনে প্রবেশ করে। জীবনে একটি পূর্ণ আকর্ষণের পথে এগিয়ে চলে সাধকের আকর্ষণ। সাধক জীবনের সব অঙ্গ আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে। জীবন ঐ পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে আগ্রহী হয়ে পারে তখন যখন আসে তার মধ্যে অনুভবের ঢেউ একটির পর একটি পর্বে জীবনকে ভরিয়ে তোলে আনন্দে। আনন্দের ঢেউ জীবনে প্রবেশ করলে জীবনের সব রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে যায়। জীবনের স্বভাব, চরিত্র সব বদল হয়ে যায়। জীবনের রূপান্তর ঘটতে থাকে। একটু একটু করে জীবনের মধ্যে এই রূপান্তর ফুটে ওঠে, প্রকাশ্যে। সাধকের স্বভাব-চরিত্র এক নতুন দিতে মোড় নেয়। স্বভাব-চরিত্রের এই নতুন মোড় জীবনের পরিচয় পাল্টে দেয়। এভাবে মানবিক অস্তিত্ব দিব্য অস্তিত্বে পরিণত হয়।

অবদ্ভি অগ্নে অর্বতো নৃভি নৄন্
ধীরেঃ বীরান্ বানুয়ামা ত্বোতা।
ইশানাসঃ পিতৃবিতস্য রায়ো বি
স্ভরয় ঃ শতহিমা নো অশ্যু।।

হে দেব অগ্নি তোমার অধীনে এমন
এগিয়ে চলুক সাধকের দিব্য অভিযান
তোমায় বরণ করে তোমারই অগ্নির পরশে
এমন আহ্বান হোক আরও দৃঢ় তোমারই
আকর্ষণে তোমার কৃপার সামর্থ্যে ও মাধুর্যে

মানবের দেব বিজয়ের এই ধারায় প্রাচীন সত্যের উন্মোচনে।
এমন দেবপ্রয়াস আসছে জীবনে আরও তীব্র হয়ে
তোমার আলোর দীপ্তি আর শক্তিতে হয়ে ভরপুর।।

ভিন্ন ভিন্ন পর্বে ভাগ হয় সাধন। এক একটি পর্বে সাধনের লক্ষ্য থাকে একেক রকম। প্রতিটি পর্বের সাধন প্রয়াস খণ্ড খণ্ড। অংশগুলির সাধন প্রয়াস অংশত। প্রতিটি প্রয়াসের রয়েছে একটি পরিণতি। প্রতিটি পরিণতি স্বতন্ত্র। প্রতিটি পরিণতি একটি অখণ্ড পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অখণ্ড পরিণতি বহু দূরের। কিন্তু সে পথের অভিযান সাধকের করায়ত্ত। সাধক যখন এগিয়ে চলেন সাধন পথে, একটু একটু করে অর্জিত এই অনুভব সঞ্চিত হয়ে বড় মাপের হয়ে ওঠে। ছোট ছোট আলোর রশ্মি সঞ্চিত হয়ে, একত্রিত করলে বড় আলোর মালা গড়ে ওঠে। ছোট ছোট এই আলোর মালা যে বড় আলো রচনা করে। একটু একটু করে জমে ওঠা এই অনুভব রাশি জীবনের পর্বে গড়ে ওঠে। জীবন সমৃদ্ধ হতে থাকে ঐ অনুভবের আলোর আর অনুভবের গাঢ়তায়। ভাগবতী কৃপার মাধুর্যে এই অনুভব খণ্ড একটু একটু করে সঞ্চিত হয়ে গড়ে ওঠে ক্রমে এক অখণ্ড সাধন। কালের বা স্থানের খণ্ডগুলি জুড়ে নিয়ে একটি পূর্ণ অনুভূতির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। খণ্ড থেকে যাত্রা শুরু করেই পৌঁছতে হবে অখণ্ডে।

সাধন সম্পদ প্রাচীন হয়েও নবীন। সাধন ধারা স্বতন্ত্র সবার জন্য। কোনও দুজন সাধকের সাধন পথ একই হতে পারে না। প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট পথ রয়েছে। একই সাধারণ মার্গের সাধনের মধ্যে প্রত্যেক সাধকের জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র। সবার জন্য প্রত্যেক সাধন মার্গের রয়েছে এক সাধারণ বিধি। এই সাধারণ বিধি একটি স্বর পর্যন্ত সাধককে এগিয়ে নিয়ে যায়। অথচ ঐ পর্বের পর আবার যোগ করতে হয় তার বিশেষ অবদান। প্রত্যেকের জীবনে এমন একটি ক্ষণ আসে যখন তার পক্ষে বুঝে নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে কোনটি তার পথ। প্রয়াস করতে করতে একটি ক্ষণ এসে যায় যখন সাধক বা ভক্ত বুঝে নেয় সে এর পর আর কোন উপায় রয়েছে যার দ্বারা ঐ প্রাণ ক্রমে উজ্জীবনের মন্ত্র পেয়ে যায়। ধ্যান আর মনন যখন জমে ওঠে, মনের দরজায় ক্রমে সাড়া দেয়। একটু একটু করে মনের পটভূমিতে নবীন মন্ত্রের উদয় হয়। এই নবীন মন্ত্রই ব্রহ্ম পথের তরণী। নিজের মধ্যে যে আহ্বান সূচিত হয় সেটিই ক্রমে গভীর উপলব্ধির রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যারা ব্রহ্মলাভের এটি শ্রেষ্ঠ পথ।

জয়মা—জয়মা—জয়মা।

—ঃঃ—

অমাবস্যার আলোয়

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

এই রাত তো তারারাত্রি
এ এক বিশেষ মুহূর্ত যখন স্বর্গ আর নরকের
দুয়েরই দরজা খুলে যায়
কে তুমি মা—
তুমি কী আদ্যাশক্তির বিশেষ রূপ আর কৌশিকী
রূপেই শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে বধ করেছিলে
দুই অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতাদের
রক্ষা করেছিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলে ধর্ম আর শান্তি
তোমার কৃপায় বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধি লাভ করেন
মহাশ্মশান তারাপীঠে শ্বেত শিমূলের বৃক্ষের নীচে
বসেই তাঁর সাধনা

অমাবস্যার এই নিশীথে দীপ্ত-নক্ষত্রের নীচে
স্বর্গ নরক দুয়ের দরজা কেমন উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে
আর যে যেমন নিজের ইচ্ছে মতো
ধনাত্মক শক্তি আহরণ করছে আত্মস্থ করছে
অঘোর চতুর্দশীর দিনটি থেকে ধীরে ধীরে
কৌশিকী অমাবস্যার দিকে
এগিয়ে চলেছি আমরা
জ্ঞানের দিব্য আলোয় আলোকিত
হয়ে উঠছে পৃথিবী।

—ঃঃ—

জলে জল

মনোজ বাগ

"প্রেমে জল হয়ে যাও গলে"— কান্তকবি বলছেন ঃ "কঠিনে মেশে না যে, মেশে রে সে তরল হয়ে।"

হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরছেন প্রেমের অন্বেষী। যা তার মন পেতে ইচ্ছা করেছে, নিজেকে তাতে গুলে যেতে দেওয়ার একান্ত ইচ্ছায়। যা তার মন চায়, তা ছলে বলে কৌশলে নিজেতে গুলে নেওয়ার অভিভাবে! একটি ভাব-এ আছে, নিজেকে অন্যের হয়ে যেতে দেওয়া আর এক ভাব-এ আছে, অন্যকে নিজের করে নেওয়। দুয়েরই ভালোমন্দ আছে, শুভ-অশুভ আছে। তবুও যে ভলোবেসে আমার হতে চায় সে বন্ধুস্বভাব, সে বন্ধুত্বের দায় নিয়ে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ভালোবেসে যে নিজের করে নিতে চায়, হাতে তার বাঁশি থাক বা অসি —সে ডাকাত-স্বভাব। সে আমার হতে চায় না। সে চায় আমি তার হই। যে প্রেম ডাকাত-স্বভাব, সে কী করে আমাতে গলবে? যে প্রেম বন্ধুস্বভাব, সে কী করে আমাকে লুটবে?

মাছ ভালোবাসে মানুষ! যে মানুষ মাছ খেতে ভালোবাসে, সে চায় মাছের তৈরি পদ দিয়ে রসনার তৃপ্তি। মাছের ভাজা, মাছের ভাপা, মাছের ঝোল, মাছের কোপ্তা, পাতুড়ি, কাটলেট। যে মানুষ মাছকে ভালোবাসে, সে করতে চায় মাছের শুশ্রূষা, মাছের সেবা। সে মানুষ চায় মাছ বেঁচে থাকুক, মাছ সুস্থ ও সমর্থ থাকুক, মাছ দীর্ঘায়ু হোক। সে চায়, সে যেন মাছের বেঁচে থাকার, মাছের টিকে থাকার অন্তরায় না হয়। সে চায়, সে যেন মাছের চলার পথের কাঁটা না হয়। প্রেমে পড়ে যে মানুষ তার প্রিয় মানুষটিতে গুলে যেতে চান, তিনি মনের দিক থেকে সেবক-প্রকৃতির। শুভানুধ্যায়ী তিনি। তিনি ভক্ত, তিনি যে ভালোবাসেন; হৃদয়, মন, প্রাণ দিয়ে তার ভালোবাসার মানুষটির তিনি ভালো চান। আবার তিনি ভালো চান, এটিই তার অভিমান। প্রেম-ভালোবাসা শুরুতে অভিমানীর করে। এই অভিমান থেকেই আসে ধ্যান, মনের প্রাণের অভিনিবেশ। এই ধ্যানই পাকাপোক্ত হয়ে রূপ নেয় পরম উপলব্ধির। উপলব্ধি যথার্থতার জ্ঞান, যথাসত্যের ধারণা।

যেমন রজ্জু। যেমন সর্প। যা রজ্জু, তা রজ্জু। যা সর্প, তা সর্প। রজ্জুতে সর্পতে মিল অনেক, অমিলও অনেক। তবু তারা এক নয়। এই প্রকৃত সত্যের জ্ঞানই যথাযথর ধারণা। সাধনার কাজ সেধে সেধে যথাযথতে পৌঁছানো, সিদ্ধ হওয়া। সমগ্র জীবনই তার ক্রিয়া। যে কোন ক্রিয়াই সাধনা। জীবন সাধনা সে দিক থেকে স্বতঃসাধনা। এর অন্ত নেই। তাই নিরন্তর। এর নিবারণ হয় না তাই অনিবার্য।

তবু সাধনা ততক্ষণই যতক্ষণ অন্য অন্য ভাব আছে, আমি -তুমি ভাব আলাদা আলাদাভাবে যতক্ষণ আছে, আমি একজন, তুমি অন্যজন। আমি তুমি অন্য অন্য। একে অন্যের অপর। আমি তুমি মিলে এক নই। একাকার হয়ে গেলে সাধনার আর ফুরসৎ নেই। তখন আমার তোমার মাঝে কোন মান-অভিমানও নেই। এই আমারটা নাও, তোমারটা দাও, নেই। কোন বিনিময় নেই তাই কোন বিকিকিনি বা ব্যবসা নেই। কারোর কাউকে উদ্ধার করার নেই, কারোর দ্বারা কারোর উদ্ধার হওয়াও নেই। তখন আইনের শাসন, সংস্কারের বাঁধন সহজ অর্থে বাতিলই হয়ে গেছে। ঈশ্বর হলেন পরম অবস্থা। মহাজগৎ পরম অবস্থাতেই আছে। প্রতিটি জীবনই পরম অবস্থায় আকণ্ঠ নিছকই ডুবে নেই — ঐ পরমে আপাদমস্তক চুবে আছে। যেন ছানার গোলা রসে ডুবেই আছে, তবে হুঁশ নেই। হুঁশ না থাকার কারণ, অন্য কিছুতে মজে আছে, তাই রসাত্মসাৎ করে রসময় হয়ে ওঠা নেই। ব্যক্তিগত আতুরতায় ব্যস্ত থেকেই আবিশ্বের মানুষ সে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়েই আছে। তাই বিশ্ব জোড়া ধর্ম ভুরি ভুরি আছে বটে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা?

আধ্যাত্মিকতা পরম অবস্থার বোধ। পরম স্বয়ং মহাজগৎ, মহাবিশ্ব। ঈশ্বর এই মহাজগতের সবটা, যাতে সব আছে। চৈতন্যের দায় আছে এই সবটা জানার। এটিই সাধনা। জানাটি যেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ঘরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা, আবার একই সঙ্গে দরজা খুলে বাইরে এসে বহিরটাকেও জানা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তবে জানাটি পরম হয় জানাটি যথাযথ হলে। এটি একটি অশেষ প্রক্রিয়া। এর কোন শেষ নেই। যদিও কোন কিছুকে যথাযথভাবে জানতে হলে নিজেকে ভুলে, আগে তার হতে হয়। এই তার হওয়াটি, তাতে গলে যাওয়া। এই তার হওয়াটিই জানার বিজ্ঞান।

আধ্যাত্ম সাধনায় গলে থাকাটাই অভীপ্সা। বরফ গলে জলে জল হয়ে থাকার সাধনা। যে গলে গেছে তার আর ভেসে থাকার, ভেসে যাওয়ার সংস্কারও নেই। তার সাধনা মিলে মিশে থাকার। যে মিলে মিশে গেছে, সে মিলে মিশে আছে। এই গলনই সাধন করে পরম আত্মসিদ্ধি। আত্মসিদ্ধি হলে নিজের সঙ্গে নিজের যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংঘাত — সবেরই ইতি হয়ে যায়। কারণ সে-ই সিদ্ধ

যে প্রকৃত সত্যটি জানে। জানে পরম কী। কী তাঁর অবস্থা, কী তাঁর ভাব। যে জানে তার আর ভয়ডর নেই। অতলে তলিয়ে যাওয়ার, নিমেষে ফুরিয় যাবার আশঙ্কা নেই।

মনের ভিতরে ক্রিয়া করে লোভ, লালসা। মনে বাসা বেঁধে থাকে মদের থেকেও ভয়ঙ্কর এক বৃত্তি, মাৎসর্য। মাৎসর্য সুন্দর বনের বাঘ। স্পর্শকাতরতা রূপ বাদাবনে ওঁত পেতে থাকে। বাগে পেলেই ঘাড় কামড়ে আস্ত জীবনটাকে বেগে এনে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। ঐ বাঘের থেকেও নিষ্কৃতি, গলে গেলেই হয়। যে গলে গেছে, সে জলে জল, সে বাতাসে বাতাস, মাটিতে মাটি। তার সব থেকেও কিছ নেই। তাকে ধরবে কে? তাঁর নাম থেকেও নাম নেই, তিনি শরীরে থেকেও শরীরে নেই। তার সব আঁকড়ে থাকার, কামড়ে থাকার জন্মান্তরের অভ্যাস, তার যন্ত্র-জীবনের প্রতিদিনকার আচার বিচার সংস্কারের যত ফিরিস্তি সবেরই ইতি হয়ে গেছে, ঐ গলে যাওয়াতেই।

জলে ভেসে আছে রেণু রেণু বরফের গুঁড়ো, কণা কণা বরফের কুচি, ভেসে আছে তাল তাল বরফের চাঁই, যোজন যোজন বিস্তৃত বরফের জমাট স্তর, হিম শৈল। হিমশৈলের এগারো ভাগের দশভাগই জলে ডুবে থাকে। সংঘর্ষে বিরাট জাহাজকেও অতলে তলিয়ে ছাড়ে। জলও জমাট বাঁধলে তা পাথরের চেয়েও কঠিন। ঐ কঠিনকেও গুঁড়িয়ে জলে গুলে দিলে তখন পাথরও জলে গোলা, যেন জলে জল। ঈশ্বর পয়োধিপ্রমাণ জল। মানুষ জলেরই জলপুতুল। রজলজাত পুতুল ঝাপাই জুড়ছে ঐ জলেই. জলের পুতুল জলে গুলে গেলে তখন আর কিছু নেই, সবই জল। জলে জল।

এখন প্রশ্ন, সব জলে জল হয়ে গেলে, জল-পুতুলদের জলকেলির কী হবে? জীবন নিয়ে হাজারো লাখো ভাবের যে রোজনামচা—তার কী হবে? জগতের পরতে পরতে জেগে থাকা রস, জীবন জোড়া রঙ্গ — তামাসা বললে তামাসা, রসদ বললে রসদ, যা অফুরন্ত — সে অনিঃশেষের কী হবে? ভক্ত ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গের কী হবে?

যা পরম ভাবে সত্য অবস্থা ভেদে তার তরতম বিশেষ হয় না। তাই পরম ভাবে যা ছিল, আছে, থাকবেও। তবে আপাত সত্যগুলির সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হেরাফিরি চলতেই থাকে।

সত্য ঈশ্বরই স্বয়ং। ঈশ্বরই পরম। ঈশ্বরের কোন প্রতিরূপ হয় না। আবার জগতের যত রূপ, সবই তাঁরই প্রতিরূপ। সবটাই যে তিনিই। কোন কিছু বাদ দিয়ে তিনি নন। তবুও অশেষ অনন্তের যে কোন একটিই বাকিটাকে আড়াল করার জন্য যথেষ্ট। নিজেকে আবিশ্ব থেকে আড়ালে, নিজের দুটি আঙুল দিয়েও রাখা যায়। তবে ঈশ্বরের নিজস্ব কোন আড়াল কোথাও নেই। নিজেকে ঈশ্বর থেকে আড়ালে রাখতেও নেই। যদিও ধর্ম সংস্কারের নামে, ঈশ্বর চর্চার নামে এই আড়াল থাকার বা আড়ালে রাখার বিলাসিতা সমগ্র মানব সমাজ জুড়েই আছে। আর এক বিলাসিতা আছে নিছকই বস্তুবাদীতার নামে নাস্তিকতা। যেখানে পরম ভাবের সধন নেই সেখানে নাস্তিকতা, আস্তিকতা যেন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে আছে। সেখানে বস্তুবাদেরই প্রতিশব্দ যেন ব্রহ্মবাদ। প্রকৃত সাধনায় এমনটা হওয়ার নয়।

যা থাকার তা ছিল, যা থাকাটা তা আছে, এবং তা থাকবেই। কারণ কোন কিছুর থাকা বা না থাকার মূলে থাকে পূর্বাপরের কার্য-কারণের সংস্কার। এই সংস্কারের কারণেই বস্তুতে বস্তুতে প্রতিনিত্যের ঠেলা-ঠক্কর নিয়ে যে পরস্পরের সহাবস্থান, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নিত্যদিনের ঝটাপটি সত্ত্বেও সহবাস–প্রতি রোজের ঘটনা।

তবুও জীবের জন্য জীবনই যজ্ঞ। যে জীবন জগৎ জোড়া। যজ্ঞ–যে অগ্নি অনির্বাণ, তার প্রজ্জ্বলন অনির্বাণ রাখার প্রতিনিত্যের ক্রিয়া, আয়োজন; তা সদা প্রজ্জ্বলিত রাখার কৌশল। এই অগ্নিই আদি। অগ্নিই আছে সবটুকু জুড়েই। ঋক বেদে ঋষি মধুচ্ছন্দা বলছেন, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।"

অগ্নিই বস্তু জুড়ে কোথাও স্ফুলিঙ্গ, কোথাও শিখা, কোথাও বহ্নি, কোথাও দাবানল। এই অগ্নিই জীবনে প্রাণ-প্রাণে চৈতন্য। চৈতন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মনের যত রাগ ও হিংসা, স্নেহ-মমতা-প্রেম, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা এ সবই অগ্নিই। অগ্নির বস্তুগত ভাব তাপ, আলো। অগ্নির চৈতন্যময় অবস্থা জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি। যে জানে তার প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান সব এক যোগসূত্রে আছে এবং তার ক্ষেম অর্থাৎ অর্জিত বা লব্ধ সমস্ত কিছুর সংরক্ষণ — আছে। তার কিছুই হারিয়ে, ফুরিয়ে নেই। যে পরম ভাবে জানে, সে আসলে নিজেতে নিজেই গলে আছে।

—ঃঃ—

মন্ত্রের সাধক

স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমা বলতেন — দেহের সাধনার জন্য মন্ত্র আবশ্যক — আমি সব-সময় মন্ত্র উচ্চারণ করি—জাগ্রত অবস্থায় এবং এমন কি যখন আমি ঘুমাই তখনও। আবার যখন আমি জামা-কাপড় পরি, খাই, কাজ করি, অন্যের সঙ্গে কথা বলি, তখনও, সবসময়ই জপ পশ্চাদপটে আমার ভিতরে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যাদের মন্ত্র আছে ও যাদের মন্ত্র নেই তাদের ভিতরের পার্থক্য তুমি সহজেই অনুধাবন করতে পারবে। যাদের কোন মন্ত্র নেই যদিও তাদের গভীর ধ্যানের বা একাগ্রতার অভ্যাস থাকে তথাপিও তাদের চারপাশে একটা অস্পষ্টতা বা কুয়াশার ভাব থাকে (hazy and vague) অন্যদিকে জপ একটা নিশ্চয়তার — একটা সংহরি ভাব নিয়ে আসে — এ একটা বর্ম—যেন তাই দিয়ে আবৃত করে রাখে সবকিছু।

দক্ষিণেশ্বরে মা শ্রীশ্রীসারদা দেবী — এক সময়ে লক্ষ জপ সম্পূর্ণ না করে মা জল গ্রহণ করতেন না। শেষ বয়সেও জপ ধ্যানে ছিল তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা। জয়রামবাটীতে অনেকে লক্ষ্য করেছেন, অসুখের সময়েও ঠিক চারটার সময় শয্যা ত্যাগ করে অন্ধকার থাকতে মা মাঠে গিয়ে শৌচাদি সেরে আসতেন। গায়ে লেপ জড়িয়ে বিছানাতে পা মেলে জপ করতে বসতেন। মন্ত্র জপের জন্য তাঁর একগাছি তুলসীর ও একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। একবার ব্রাহ্মমুহূর্তে, একবার পূজার সময় একবার অপরাহ্নে এবং একবার সন্ধ্যায় জপ-ধ্যান করতেন। তাই তো পরবর্তীকালে মা ভক্ত-সন্তানদের বলছেন ঃ ‘জপাৎ সিদ্ধি’।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনে দেখা যায় ভগবানকে পাবার জন্য তাঁর তীব্র সংবেগ এসেছিল। ভগবানকে পেয়ে তিনি বলেছিলেন, ভাগ্যিস এই জীবনেই ভগবানকে পেয়েছি, না হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত। কিন্তু কিসের এ সর্বনাশ? এই জীবনেই বা কেন পেতে হবে, কিসের এত তাড়া? ঋষিরা জেনেছিলেন, মৃত্যু ছায়ার মত জীবের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এবং যে কোনো মুহূর্তে অতর্কিতভাবে তাকে গ্রাস করে জীবনের গতিপথ রুদ্ধ করে দিতে পারে। চুরাশি লক্ষ জীবন ভ্রমণ করে যে দুর্লভ জীবন মানুষ লাভ করে মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে মৃত্যুর কবলে পড়ে। যদি অমৃতত্ব লাভ করার পূর্বে মৃত্যু আসে তাহলে আবার জন্ম আবার মৃত্যুর আবর্তে তাকে ঘুরতে হয়।

এই রকম মৃত্যুকে ঋষিরা ভয় করতেন। ভয় করতেন ঐ আবর্তের অবিসম্ভাবী ক্লেসগুলিকে যা রোগ, শোক, জরা, দুঃখ ব্যাধি দুঃখ দারিদ্র মোহগ্রস্থথা ইত্যাদি আশ্রয় করে পীড়া দেয়। যাজ্ঞবল্ক্যের ভীতি এবং তাড়া ছিল সেই জন্য। — ঋষিরা জেনেছিলেন জন্ম-মৃত্যুর ঐ আবর্তের ক্লেশ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে। মৃত্যুর যেখানে চির সমাপ্তি অতিমৃত্যু, তাই লাভ করতে হবে, অমৃত হতে হবে।

শ্রীরমন মহর্ষি বলতেন — মূর্ত্তি-ধ্যান ও নাম-জপ দ্বারা মন একাগ্রতা লাভ করে সর্বদা চলনশীল হস্তী-শুণ্ডে একটি শৃঙ্খল প্রদান করিলে সেই হস্তী যেমন অন্য কিছু গ্রহণ না করিয়া হাই লইয়া চলিতে থাকে, সদা চঞ্চল মনও সেই প্রকার কোন নাম বা রূপে অভ্যস্ত হইলে উহাই ধারণ করিয়া থাকে। মন অসংখ্য চিন্তারূপে বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া প্রত্যেকটি চিন্তা অতি বলহীন হয়। চিন্তারাশি প্রশমিত হইতে হইতে একাগ্র স্থিতি লাভ করিয়া তাহা হইতে বল প্রাপ্ত মনের পক্ষে আত্মা-বিচার সুলভে সিদ্ধ হয়।

শ্রী রমন নিজে কখনও কথা বলতেন না। কথা বলবেন না এমন কোন প্রতিজ্ঞা অবশ্য তাঁর ছিল না, আসলে কথা বলার কোন ইচ্ছাই তাঁর হতো না।

মন অত্যন্ত শক্তিশালী। ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকলে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। তাকে ধ্যানের দ্বারা একত্রিত করতে পারলে তার পরিনাম হয় অভূত পূর্ব। যেমন সূর্যের কিরণকে লেন্সের সাহায্যে ফোকাস্ করলে আগুন জ্বলে ওঠে ভাপকে এক কেন্দ্রে একত্রিত করলে সেই শক্তিতে রেল চলে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা মনের শক্তিকে একাগ্র করতে পারলে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে অদ্ভুত সফলতা পাওয়া যায়।

মন্ত্র জপের নিয়ম হলো — প্রথমে গাড়িটাকে Self starter সাহায্যেই হোক হ্যান্ডেল মেরেই হোক, ধাক্কা দিয়েই হোক, কোন রকমে স্টার্ট করিয়ে নাও, তারপর দেখবে আপন গতিতে আপনিই চলতে থাকবে। শুধু লক্ষ্য স্থির রেখে স্টিয়ারিং ধরে বসে থাক

— গন্তব্যে ঠিক পৌঁছে যাবে। ভেতর থেকে না হওয়া পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়।

গাড়ি বিকল থাকলে জোড়ে ঠেলে তাকে চালাতে হয়। ভাল না লাগলেও মন না বসলেও জোর করে জপ করে যাও। নির্দিষ্ট সময় যতটা জপ করতে পার তাতো করবেই, তারপর হাটা চলার পথেও চালিয়ে যাও।

একবার সুরগুলি আয়ত্বে এসে গেলে তখন শয়নে-স্বপনে, জাগরণে, শ্রমে-বিশ্রামে সকল অবস্থায় আপনিই চলতে থাকবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে Carry করবে। তখন আর চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। Reflex action এর মত শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মত একটা স্বাভাবিক ক্রিয়ায় পরিণত হবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পর্যন্ত টানটা নিম্নগামী থাকে।

বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, কপিল, কনাদ, গৌতম, ব্যাস থেকে শুরু করে বর্তমানের সিদ্ধ সাধু এবং ঋষি মহর্ষিদের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র উপাসকদেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

কয়েক দিন আগে পর্যন্ত বৃন্দাবনের কাঠিয়াবাবা নিজের ঐশ্বর্য এবং ঋদ্ধি-সিদ্ধির কারণে সর্বসাধারণের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন। তার নাম ছিল মহাত্মা রামদাস, কিন্তু তিনি কাঠের কৌপিন পরতেন, সেইজন্যই মানুষ তাকে কাঠিয়া বাবা নামে অভিহিত করত।

গায়ত্রী মন্ত্র জপ উপাসনার প্রতি আকর্ষণ ছিল তীব্র। নিজের গ্রামের এক বটগাছের নিচে বসে তিনি নিয়মিতভাগে গায়ত্রী জপ করতেন। সেখানে সম্পূর্ণ একান্তে তিনি তিন-চার ঘণ্টা সাধনা করতেন। সেই সময় রামদাসের সামনে ধ্যানের মধ্যে সেই দৃশ্যমান প্রতিকৃতি সাকার হয়ে উঠল। সেই প্রতিকৃতি ছিল মা গায়ত্রীর। আশীর্বাদ মুদ্রায় সেই দৃশ্যমান প্রতিকৃতি রামদাসকে যেন ইশারা করে বলছেন, "বৎস, এবার তুমি তোমার অবশিষ্ট জপাংশ জ্বালামুখীতে গিয়ে সম্পূর্ণ কর। শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবার মন সদা সর্বদা আধ্যাত্ম চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে থাকল। বলা হয়ে থাকে গায়ত্রী জপ সিদ্ধ হবার পর এমন কিছু বাকি ছিল না, যা তিনি লাভ করেননি।

দেহ ধ্বংস হইলেও নামে রবে তুমি।
অনন্ত ব্যোমেতে রবে ছাড়ি মর্ত্যভূমি।।
চিতাগ্নিতে দেহ যবে ভস্মীভূত হবে।
চিতাগ্নির শব্দে তুমিও ধ্বনি শুনিবে।।
গুরুমূর্ত্তি নামমূর্ত্তি চিরসাহি তব।
সূক্ষ্মদেহে স্মৃতিপটে সদা অনুভব।।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে

আশুরঞ্জন দেবনাথ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর ২৪ পরগণা, ২১/১০/৬৬, শুক্রবার, মহাষ্টমী — ৭ম দর্শন।

নরেন্দ্রপুর, প্রথম দর্শন। যাবার আগে স্বামীজির চিঠি পেলাম ১৪/১০/৬৬ তারিখে নরেন্দ্রপুর থেকে লিখেছেন,

"****** পূজার সপ্তাহটা নরেন্দ্রপুরেই থাকব। কিন্তু অতিথি আছে সে সময়, সুতরাং একান্তে কথা হবে না — ছোট্ট বাড়ি কিনা। ২৩শে রবিবার সকালে কেঁয়াতলায় ঠাকুর দেখতে যাওয়া খুবই সম্ভব। আর ২৪শে তো দুপুরবেলা গাড়ী। সুতরাং এ যাত্রা তোমার সাথে দেখা হলেও একান্তে কথা বলার সুযোগ বোধ হয় হবে না।"

তারপর লিখেছেন, "মনের দুটো ভাগ—একটা তার বহির্বাটী, আরেকটা অন্তঃপুর। বহির্মন আর অন্তর্মন। বহির্মন নানা বিষয় নিয়ে ভাববেই। কিন্তু ঠিক সেই সময় অন্তর্মন আকাশের মত শান্ত থাকতে পারে — সবসময়। এর জন্যই আকাশ ভাবনার কথা বলি, যাতে ভিতরটা জেগে ওঠে। ভিতরে একটা মহাশূন্যতা আছে — শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ তার প্রাথমিক রূপ। প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়বার সময় আমরা এই মহাশূন্যে প্রবেশ করি। যদি জেগে ঘুমাতে পারি, তাহলে এই তটস্থ অন্তর্মনকে পেতে পারব না কেন? তখন এই মনে মানবী চিন্ময়ী হয়ে দেখা দেন। যাকে আমার প্রাণ চায়, সব ছাপিয়ে যাকে চেয়ে এসেছি শিশুকাল হতে, সে যেন ভোরের আকাশে আলোর মত ফুটে ওঠে চেতনার ওই নেপথ্য পটে। ******"

ছুটিতে বাড়িতে ছিলাম — কাটোয়ায়। সকালের গাড়িতে কলকাতায় এলাম। যাব নরেন্দ্রপুর — আমার জীবন-তীর্থে। এর আগে কখনো যাইনি। এই প্রথম। পথ-ঘাট চিনি না। হাওড়া থেকে বাসে গড়িয়া হয়ে নরেন্দ্রপুর এলাম। প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল কলেজ দেখলাম। অনেক জায়গা জুড়ে বিশাল প্রতিষ্ঠান। পূজার ছুটি, তাই সব বন্ধ। তারপর বেরুলাম 'হৈমবতীর' খোঁজে। বেলা তখন দেড়টা কি দু'টা। দেখা করার সময় সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা। ভাবলাম খুঁজে তো রাখি, পরে সময়মত যাব। কোনদিকে যাব কিছুই জানি না; কোনদিন আসিনি। স্বামীজির কাছে কিছু জেনেও নিইনি। আন্দাজে এক রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। ছায়াঘেরা নির্জন পথ। একটু এগিয়ে একজন গ্রাম্য পথচারীকে পেলাম। জিজ্ঞাসা করে সব খবরই পেলাম। ঠিক পথই ধরেছি, আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। পেলাম। গেট তালা দেওয়া। নির্জন 'হৈমবতী'। স্বামীজি নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় ব্যস্ত। বাইরে Letter Box-এ নাম-ঠিকানা লিখা রয়েছে। ছোট্ট একটা সাইন বোর্ডও রয়েছে। খুব আনন্দ পেলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, সারাদিন পরিশ্রমের সার্থক পরিণতি।

মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালাম। সুন্দর শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ। ছায়া সুনিবিড় শান্ত নীড়। রাস্তা যদিও পীচঢালা, কিন্তু শান্ত-নীরব গ্রামের রাস্তা। গাড়ী ঘোড়ার যাতায়াত একটা নাই আম-কাঁঠালের বাগান ঘেরা ফাঁকা ফাঁকা বাড়িঘর। ঘাট বাঁঠানো পুকুর; ধানের ক্ষেত। রাস্তায় বিদ্যুতের আলো; বাড়িতেও। পাঁচটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। ক্লান্তি নেই; নেই ক্ষুধাতৃষ্ণা। মন আনন্দে ভরপুর। পশ্চিম আকাশে সূর্য লাল হয়ে ঢলে পড়ল। পাঁচটা বুঝি বাজল। সাক্ষাতের সময় সাড়ে পাঁচটা। এক দোকানের সামনে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম তীর্থভূমির দিকে। গেট তখনো তালাবন্ধ; সবসময়েই মনে হয় তাই থাকে।

স্বামীজি বাইরে কাজ করছেন, কাস্তে হাতে ফুলগাছের পরিচর্যা করছেন। একটু দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন, "কে, আশু"। একটি মেয়ে এসে গেট খুলে দিল। স্বামীজি আগেই জানিয়েছেন যে পূজায় বাড়িতে অতিথি থাকবে। ছোট্ট নতুন বাড়ি; সাজানো গুছানো। তখনো সাড়ে পাঁচটা বাজেনি। স্বামীজি বলনে, "বস আমি আসছি।" মেয়েটি বারান্দায় চেয়ার পেতে দিয়েছে। স্বামীজির সাথে আরেক বয়স্ক মালীও বাগানে কাজ করছিলেন। স্বামীজি যতক্ষণ বাগানে কাজ করছিলেন, আমি নিরবে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, কর্মে নিরত যোগীবর। মনে পড়ছিল কোনও এক সাক্ষাতকারে স্বামীজি পাওহারীবাবার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "ধ্যান যতটা মনোযোগ দিয়ে করবে, মাটিটিও ততখানি মনোযোগ দিয়ে মাজবে।" সাড়ে পাঁচটা বাজল। স্বামীজি হাত ধুয়ে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। ছোট্ট বারান্দা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বললাম, 'স্বামীজি চিঠি পেয়েছেন?" বললেন, "পেয়েছি; তোমার চিঠি আসতে বড় দেরী হয়, সাত-আট দিন লেগে যায়।" আজ আর কারও আসার কথা আছে? স্বামীজি বললেন, 'না'। জানতে চাইলাম আমি না এলে স্বামীজি আরও বাগানে কাজ করতেন কিনা? জবাবে বললেন, 'না; সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এখন বসে থাকতাম।' তারপর কলকাতায় কবে যাবেন, ২৩ তারিখ রবিবার দেখা হবে কিনা খোঁজ-খবর নিলাম।

একটু সময় নিরব থেকে স্বামীজি পূর্ববর্তী চিঠির সূত্র ধরে বললেন, 'বাইরের এলোমেলো ভাবনা গুছিয়ে আনতে হবে — জীবনটাকে ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করে। তাহলে ভিতরের ভাবনায় জোর ধরবে। ভিতরের ভাবনাকেও একাগ্র করতে হবে। একাগ্রতা ছাড়া যোগ হয় না। এও বলতে পার — বাইরে-ভিতরে একাগ্রতাই যোগ। ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে যে দ্বিধায় ভুগছিলাম সে প্রসঙ্গে বললেন, 'দোটানায় জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না। যারা সংসারের মধ্যে থেকেই তার ভোগ এবং কর্মকে স্বীকার করে নিয়েই ভগবানের আলোয়, আত্মার আলোয় নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে তারাই সবচাইতে ভাল।"

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা অবধি ছিলাম। যদিও সাক্ষাৎকারের সময় ছিল সাড়ে ছ'টা অবধি। স্বামীজি আমায় সময় দিয়েছেন সাড়ে সাতটা পর্যন্ত; যদিও আমি একা ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ে স্বামীজি জাগতিক, আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ে বলেছেন; আমি তন্ময় হয়ে শুনেছি, মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন করেছি। শরতের আকাশে অষ্টমীর চাঁদ। স্নিগ্ধ, নির্জন পল্লী প্রকৃতি। পবিত্র তপোবন। এক আনন্দোজ্জ্বল সন্ধ্যা। স্বামীজির যে সুদীর্ঘ কথোপকথন অনেকটাই মনে রাখতে পারিনি। স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে সে আনন্দ-সন্ধ্যার অম্লান জ্যোতি। স্বামীজির পাশে বসলে এক নিবিড় তন্ময়তায় ডুবে যাই। সময় কখন বয়ে যায় বুঝতেও পারি না। এমন স্নিগ্ধ শান্ত প্রকৃতির মাঝে স্বামীজিকে কখনও পাইনি; পাইনি এমন নিত্যদিনের স্বামীজিকে। ধন্য আমার এবারের যাত্রা; কৃতার্থ আমি।

সময় হয়ে এল। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। স্বামীজি সাথে সাথে এসে গেট খুলে দিলেন।

*** *** ***

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st February 2024
Magh–1430
Vol. 21. No. 10

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.